ভারত ললনা

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত।

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত ললনা,
কোথা দিতে তাদের তুলনা ?

১৩২৩।

প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
২৬, বেচারামের দেউড়ী,
ঢাকা।

মূল্য ॥৶০ আনা।

উপহার
প্রিয়তমাস্ত —

বিজ্ঞাপন।

ভারত-ললনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ "ভারত মহিলা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিবিধ ইংরেজী বাঙ্গলা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র অবলম্বনে সপ্ত বিংশতি ভারত ললনার জীবনের পবিত্র কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারত ললনা পাঠক পাঠিকা সমাজে গৃহীত হইলেই সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

রাণীগঞ্জ—ঘোড়াঘাট,
দিনাজপুর।
৬ই শ্রাবণ, ১৩২৩।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সূচীপত্র

চিত্র সূচী

বুদ্ধদেব।

ভারত ললনা

পঞ্চ থেরী

থেরী শব্দের অর্থ স্থবিরা অথবা জ্ঞানবৃদ্ধা। যে সকল রমণী সাক্ষাৎ ভাবে বুদ্ধদেবের উপদেশ লাভ করিয়া মুক্তিমার্গের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যে থেরী নামে খ্যাত রহিয়াছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র সুত্তপিটকে এইরূপ ৭৩ জন থেরীর জীবন বৃত্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের আর্য্য সমাজে স্ত্রী জাতির অবস্থা কীদৃশ ছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব কালে আর্য্যনারী সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন; তাঁহাদের অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও আন্তরিকতা লাভ করিয়া এবং নানা বিষয়ে মনস্বিতা প্রদর্শন করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সুত্তপিটক বর্ণিত ৭৩ জন থেরীর চরিত বঙ্গ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তদবলম্বনে ৫ জন থেরীর জীবন কথা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ভদ্রা

থেরী ভদ্রা জন্মগ্রহণ করিয়া রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠী বণিকের গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। এই গৃহের কুলপুরোহিতের সার্থক নামে এক পুত্র ছিল। যুবক সার্থকের কান্তি রমণীয় ছিল, তাহার রমণীয় কান্তি দর্শনে কিশোরী ভদ্রার হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্বরাগিণী বাজিয়া উঠে; তিনি তাহার প্রেমানুরাগিণী হইয়াছিলেন। সুন্দর সার্থকের অন্তর বড় কুৎসিৎ ছিল, তাহার পাপরাশি মনোহর কান্তি এবং মনোজ্ঞ বাগজাল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। রাজগৃহাধিপতি চৌর্য্যা-পরাধে তাহাকে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন, ঘাতকেরা তাহাকে সিংহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বধ্য ভূমিতে লইয়া চলিল। প্রেমান্ধ অবলা ভদ্রা প্রেমাস্পদের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং পিতার নিকট আপন অন্তর্নিহিত প্রেম প্রকাশ করিয়া সার্থকের জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করিলেন। শ্রেষ্ঠী পিতা আপন স্নেহপুত্তলী দুহিতার মনোরঞ্জন জন্য বহু উৎকোচ দানে ব্রাহ্মণ কুমার সার্থককে মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিলেন।

সাধ্বী রমণীর বিমল প্রেম সার্থকের কুচরিত্র সংশোধন করিতে অসমর্থ হইল। একদিন সার্থক তাহাকে বলিল, আমি চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া উদ্ধার কামনায় পর্ব্বতশিখরে দেবতার পূজা মানস করিয়াছিলাম। এখন দেবতার পূজা দিতে মনন করিয়াছি, তুমি অলঙ্কৃতা হইয়া আমার সহগমন কর, আমি পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া সস্ত্রীক দেবতার পূজা করিব। সরলা নারী পতিসহ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিলেন। এই নির্জ্জন স্থানে সার্থক পত্নীর অলঙ্কার অপহরণ অভিপ্রায়ে তাহাকে বধ করিতে উদ্যোগী হইল। তখন ভদ্রা

প্রাণরক্ষার জন্য ছলনা করিয়া বলিলেন, আমি তোমার একান্ত প্রেমানুরাগিণী। আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে, এই সময় একবার তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করি। সার্থক সম্মত হইলেন; ভদ্রা তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান ব্যপদেশে শিখর পার্শ্বে আনয়ন করিল; তাহার কৌশলে সার্থক পদস্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হইল। এই অবসরে ভদ্রা অলঙ্কারাদি তথায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

অতঃপর ছিন্নকেশা একশাটী রমণী বিভ্রান্ত চিত্তে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই সময় একদা তিনি গৃধ্র কূট পর্ব্বতের ভিক্ষু সঙ্ঘের পুরোভাগে ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার প্রাণোন্মাদকর উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভদ্রা গুরুর কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; তাহার সমস্ত ক্লেশ, সমস্ত চিত্ততাপ দূরীভূত হইল; তিনি মগধ, অঙ্গ, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অসীম উৎসাহে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে পঞ্চাশৎ বৎসর গত হইল। ধনশালী শ্রেষ্ঠী-কন্যা ভদ্রা ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবারণ করিতেন; পুণ্যার্থী উপাসক প্রদত্ত শাটী তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিত; সে বসনে তাঁহার দেহ আবদ্ধ থাকিত; কিন্তু প্রাণ মুক্ত,—বন্ধন শূন্য ছিল।

পটাচারা

পটাচারা বাল্যকালে পিতৃ ভবনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। শ্রাবস্তী নগরীর একজন শ্রেষ্ঠী বণিকের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ধনশালী পিতা তাঁহাকে পরম বাৎসল্যে প্রতিপালন করেন। কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইলে স্নেহশালী পিতা তাঁহাকে এক ধনবান বণিক কুমারের

সহিত পরিণয় সূত্রে বন্ধন করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু পটাচারা একজন প্রতিবাসী দরিদ্র যুবকের প্রেমের মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া গোপনে পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেমাস্পদ যুবক সহ দূরদেশে পলায়ন করিলেন।

এই দূরদেশে ক্রমান্বয়ে দুইটি পুত্ররত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রেমসর্ব্বস্ব দম্পতীর আনন্দ বর্দ্ধন করিল। তাঁহারা পুত্র মুখ দর্শন করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং দারিদ্র্য দুঃখ বিস্মৃত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদা স্বামী কাষ্ঠ আহরণ জন্য বনে গমন করিয়া সর্প দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। প্রাণাধিক স্বামীর মৃত্যুতে অবলা পটাচারা একেবারে আশ্রয়হীনা হইয়া পড়িলেন এবং পিতৃস্নেহ স্মরণ পূর্ব্বক শিশুপুত্র দুইটিকে লইয়া পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে হতভাগিনী পটাচারার সর্ব্বনাশ হইল। ক্রমান্বয়ে তাঁহার নয়নের মণি পুত্রদ্বয় মাতার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। পটাচারা শোকদগ্ধচিত্তে শ্রাবস্তী নগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি এখানে আসিয়া দেখিলেন, বাত্যাতাড়িত গৃহতলে পতিত হইয়া তাঁহার পিতা মাতা এবং ভ্রাতার এক সঙ্গে প্রাণান্ত হইয়াছে।

অসহ্য শোক দুঃখে পটাচারার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি উন্মাদিনী হইয়া আপন শোকগাথা গাহিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধদেব এবং তদীয় নবধর্ম্মের মহিমায় আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। একদিন আপন শোক-কাহিনী বিবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের পদযুগলে পতিত হইলেন। বুদ্ধদেব মধুর বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার অমৃত তুল্য উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি সমস্ত শোক দুঃখ বিস্মৃত হইলেন, থেরী দল ভুক্ত হইয়া শতশত শোকাকুলা নারীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। অচিরে ভারতবর্ষের ধর্ম্মসমাজে তাঁহার

প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহার মধুর উপদেশে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে সংসারতাপক্লিষ্টা নারী বুদ্ধদেব এবং নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।

অম্বপালী

অম্বপালী প্রসিদ্ধা বৌদ্ধ রমণী। তাঁহার জীবন কথা বৌদ্ধ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। অম্বপালীর অপূর্ব্ব রূপের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। তিনি প্রথম যৌবনে আপন অতুল রূপের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি তাদৃশ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অগাধ ধনের অধিকারিনী হইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের অন্যতম লীলাক্ষেত্র বৈশালী নগরীর পার্শ্ববর্ত্তী কোটিগ্রামে তাঁহার সুদৃশ্য বাসভবন, সুবৃহৎ উপবন এবং সুবিস্তৃত আম্রকানন শোভা পাইত। ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে বৈশালীতে লিচ্ছবি বংশীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা বুদ্ধদেবের সাতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই কারণ তদীয় জীবনের অনেকাংশ বৈশালী নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বৈশালীতে আগমন করিয়া মহাবন নামক উদ্যান বাটিকায় বাস করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের চতুঃচত্বাবিংশ বর্ষে (এই সময় তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল) তিনি বৈশালীতে উপনীত হইয়া বারনারী অম্বপালীর আম্রকাননে গমন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক অম্বপালী আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং তদীয় সকাশে উপনীত হইয়া পরদিন মধ্যাহ্নে আহার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পতিতা বারনারীকে সৎপথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অম্বপালী সগর্ব্বে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথে ভগবান বুদ্ধদেবের দর্শনাভিলাষী লিচ্ছবিদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা তদীয় প্রমুখাৎ ভগবানের নিমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুব্ধচিত্তে তদীয় সমীপবর্ত্তী হইয়া অম্বপলীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ জন্য সানুনয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহাদের অনুরোধে অম্বপালীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে অসম্মত হইলেন। তখন ভক্ত লিচ্ছবিগণ দুঃখিত অন্তরে প্রস্থান করিলেন এবং অম্বপালীর ভবনে উপনীত হইয়া বুদ্ধদেবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। লিচ্ছবিদের অনুগ্রহপালিতা রূপ জীবিনী অম্বপালী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অম্বপালীকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু বারনারী অম্বপালী সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আপন সংকল্পে অটল রহিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে ভগবান বুদ্ধদেব অম্বপালীর গৃহে আহার করিলেন। তাঁহার অমৃতময় উপদেশে অম্বপালী অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বহু বিনয়বচনে আম্রকানন সহ সমগ্র সম্পত্তি বৌদ্ধ সঙ্ঘের উপকারার্থ উৎসর্গ করিলেন। অতঃপর অনুতপ্তা বারনারী থেরী শ্রেণীভুক্ত হইলেন; তাঁহার বহুযুগব্যাপী সেবাব্রত কত মাতৃহীন শিশুর ব্যথা প্রশমিত করিয়াছে, কত স্বজনবিয়োগবিধুরের হৃদয়ক্ষতে প্রলেপ প্রদান করিয়াছে, কত শঙ্কিত মৃত্যুপথযাত্রীকে চিরশান্তির অধিকারী করিয়াছে; তাঁহার সুরচিত মনোহর গাথা অদ্যাপি নরনারীর মোহ-মুদ্গর রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঋষি দাসী

থেরী ঋষি দাসীর চরিত্র কথা বিচিত্র রসসঞ্জাত। ঋষি দাসীর জন্মভূমি ভারতললামভূতা উজ্জয়িনী। তাঁহার পিতা ধন-ধান্য পূর্ণ উজ্জয়িনীর একজন শ্রেষ্ঠী বণিক ছিলেন। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মদোষে * ঋষি দাসীর তিন বার বিবাহ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারেই তিনি

---

* এরকচ্ছ নগরেতে ছিল এক ধনী স্বর্ণকার ;
ছিনু তার পুত্র আমি, যৌবনে করিনু পরদার।
মরিয়া নিরয় ভোগ করিলাম দীর্ঘকাল ধরি,
বানর হইয়া পরে আর জন্ম লাভ করি।

* * *

সিন্ধুদেশে গিয়া এক অরণ্যেতে যবে মরিলাম
কাণা আর খোঁড়া এক ছাগী গর্ভে জন্ম লভিলাম।

* * *

গো বণিক গৃহে এক গো উদরে হইল জনম ;
খাটিনু বলদ হয়ে বারমাস, এমনি করম।

* * *

তার পর হল জন্ম দীনা এক ধীথি দাসী ঘরে ;
হইলাম নপুংসক ; পরদারে এই ফল পরে।
বত্রিশ বছরে মরি শকট চালক দরিদ্রের
কন্যা হয়ে জন্মিলাম, ঋণ গ্রস্ত বহু বণিকের।
অনেক শুদের দায়ে শ্রেষ্ঠী এক একদা বাঁধিয়া
ধরে নিয়ে গেল মোরে বিলাপিনু কতনা কাঁদিয়া।
ষোড়শী হইনু যবে, হেরি মোরে কুমারী যুবতী
শ্রেষ্ঠী পুত্র গিরিদাস হইল আসক্ত মোর প্রতি।
অন্য ভার্য্যা ছিল তার শীলে গুণে যশে চমৎকার
পতি প্রাণা। আমি কিনা ভাঙ্গিলাম কপাল তাহার।

বিজয় বাবুর থেরী গাথা।

স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। প্রথম বিবাহ অন্তে ঋষি দাসী অনুক্ষণ প্রেমপূর্ণ চিত্তে স্বামীর সেবা করিতেন; শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহাকে রূপসী লক্ষ্মী বলিয়া আদর করিতেন; কিন্তু স্বামী সাধ্বী পত্নীর হৃদগত ভালবাসা এবং সেবা শুশ্রূষা তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর ঋষি দাসীর পিতা মাতা অর্দ্ধ শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বরে সমর্পণ করিলেন। এ স্বামী ধনাঢ্য; ঋষি দাসী তাঁহার কুল আশ্রয় করিয়া দাসীর মত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; বিবিধ বিধানে স্বামীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই স্বামীও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুইবার বিনা দোষে দণ্ড হইল। এই সময় একদা একজন সংযতচিত্ত দীনহীন যুবা ভিক্ষার্থ তাঁহার পিতৃ ভবনে উপনীত হইলেন। ঋষি দাসীর পিতা মাতা বহু সমাদরে এই ভিক্ষুককে গৃহবাসী করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিলেন। নব জামাতা এক পক্ষ গৃহে অবস্থিতি করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং চীবর ঘটিকা গ্রহণপূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষান্ন অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। এইবার দুঃখ ও লজ্জায় ঋষি দাসীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি প্রব্রজ্যায় জীবন যাপন অথবা প্রাণ নাশ করিবার জন্য পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে গৃহে বাস পূর্ব্বক সাধু জনের সেবা করিয়া সাধুতা লাভ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ঋষি দাসী পুনঃ পুনঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন পিতা মাতা অশ্রুমোচন করিতে করিতে স্নেহের পুত্তলী কন্যারত্নকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার কৃপায় ত্রি বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রত পূর্ণ করিলেন; তাঁহার সমস্ত দুঃখ,—সমস্ত অনুশোচনার অন্ত হইল।

সুমেধা

পুরাকালে মন্তাবতী নগরীতে কোঞ্চ নামক এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। মন্তাবতীর রাজভবনের প্রমোদ ও বিলাসের লীলাক্ষেত্রে সুমেধার জন্ম, কিন্তু সুখৈশ্বর্য্যপালিতা সুমেধা কৈশোর কালেই ভগবান বুদ্ধ এবং তদীয় ধর্ম্মের অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। পৃথিবীর মৃত্যু ও শোক তাঁহার তরুণ হৃদয়ে বৈরাগ্য আনয়ন করে, তিনি অপ্রমেয় সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় জীবন যাপন করিবার জন্য পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থিনী হইলেন। হৃদয়শোণিত তুল্যা কন্যার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাজা কোঞ্চ ব্যথিত হইলেন; রাজ মহিষী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাণাধিকা কন্যার মতি পরিবর্ত্তন অভিপ্রায়ে তাঁহার সমক্ষে সংসারের সুখচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শন করিলেন, বরণাবতীর রাজা অনিকর্ত্তকে তাঁহার পাণি গ্রহণ জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণে রাজা অনিকর্ত্ত সুন্দরী সুমেধার প্রেমার্থী হইয়া উপনীত হইলেন। তিনি মধুর বচনে কুমারী সুমেধাকে সম্বোধন করিয়া প্রেম ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল; মুক্তি অনুরাগিণী সুমেধার হৃদয় মন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত ছিল, সে সৌন্দর্য্যের দীপ্তির নিকট পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য আপনা আপনি মলিন হইয়া পড়িত; তিনি তাদৃশ অপার্থিব সৌন্দর্য্যের উপভোগ কল্পে পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পদ তুচ্ছ করিলেন। কিশোরী সুমেধা রাজ-প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া মহা প্রেমে মত্ত হইলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের চরণাশ্রয়ে শান্তি লাভ করিলেন, তাঁহার সকল তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল, তাঁহার হৃদয় মন মুক্ত ও শুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ত্রয়ী

রুক্মাবতী

(দয়া)

বৌদ্ধযুগে উৎপলাবতী নগরীতে রুক্মাবতী নাম্নী একজন সম্পত্তিশালিনী দয়াবতী বৌদ্ধমহিলা বাস করিতেন। তিনি যে পল্লীতে বাস করিতেন, তাহার কোন নরনারীর অন্নবস্ত্রাভাবজনিত ক্লেশভোগ বার্ত্তা কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সে ক্লেশভোগ দূর করিবার জন্য যত্ন করিতেন। পল্লীতে কেহ কষ্টে পতিত হইয়াছে কিনা তিনি সর্ব্বদা গোপনে সে বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া ক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ বিমোচনে যত্নবতী হইতেন। একদা মূর্ত্তিমতী দয়া রুক্মাবতী রাজপথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটি দুর্ভিক্ষক্লিষ্টা নারী খাদ্যাভাবে অনন্যোপায় হইয়া তাহার সদ্যোজাত শিশুর জীবদ্দেহ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সে সময় সে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর আর্ত্তনাদে বোধ হইত যে, সমস্ত স্থান শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্পাদনার্থ যেন লোল জিহ্বা বিস্তার করিতেছিল। তরুলতা, পত্রপুষ্প এবং তৃণাঙ্কুর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর জঠরানলের তৃপ্তি সাধনে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত নরনারীদের দেহ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমগ্র দেশ বিরাট শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। দয়াবতী রুক্মাবতী যখন দেখিতে পাইলেন যে, সদ্যপ্রসবা নারী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া নবজাত শিশুর দেহ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মানবীর চিত্তবৃত্তির কলুষতা কি প্রকারে এরূপ ভয়ঙ্কর পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে! জগতের স্বাভাবিক রীতিনীতি কি ভয়ঙ্কর রূপে সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে! মাতা নিজ দেহ পোষণার্থ জীবিত পুত্রের দেহমাংস উদরসাৎ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্পাদন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। এইরূপ ভাবে ভাবিতে ভাবিতে রুক্মাবতী সেই ক্ষুধাতুরা নারীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষুধার্ত্তে,ক্ষান্ত হও।" তখন সেই ক্ষুৎ প্রপীড়িতা নারী বলিল, তবে কি আহার করিব? দেশে স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক পাতা ঘাস আদি পর্য্যন্ত লোকের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন কি আহার করি? রুক্মাবতী বলিলেন, "ক্ষান্ত হও। আমি গৃহ হইতে খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিয়া তোমাকে দিতেছি। তুমি তোমার এই সদ্যোজাত শিশুর দেহ ভক্ষণ করিও না। ক্ষান্ত হও।" এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া বুদ্ধিমতী রুক্মাবতী কিয়ৎক্ষণের জন্য ঐ নর-পিশাচীকে নিবৃত্ত করিলেন। সেও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই রুক্মা ভাবিলেন, যদি আমি খাদ্য আনয়ন করিতে গৃহে গমন করি, তাহা হইলে সেই অবকাশে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যদি এই নারী শিশুটিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত, শিশুর প্রাণরক্ষা করা হইল না। আর শিশুটির প্রাণ রক্ষার্থ যদি আমি মাতৃক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক শিশুটিকে লইয়া যাই, তাহা হইলে শোকে তাপে ও জঠরানল জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রসূতাও ইহলীলা সংবরণ করিবে। সুতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাই কিরূপে? এই প্রকার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় রুক্মাবতী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু অবিলম্বে তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। অটল স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে একখানি শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা স্বীয় মাংসল স্তন দ্বয় কর্ত্তন করিয়া সন্তানরুধিরলোলুপা নারীকে প্রদান করিলেন। বিকট

ভৈরব ভাবে ক্ষুধার্ত্তা হস্ত প্রসারণ করিয়া ঐ স্তন্য মাংসপিণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মহীয়সী রুক্মাবতী শিশুটিকে লইয়া পলায়ন করিলেন; তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত রুধির ধারা উৎপদ্মাবতী নগরীর রাজমার্গ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল।*

খনা ও লীলাবতী

(বিদ্যা)

খনা ও লীলাবতী বিদুষী ভারত-রমণী। সুদূর অতীত কালে এই দুই মনস্বিনী নারী ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের জ্ঞানের প্রদীপ্ত প্রভায় ভারতবর্ষ উজ্জ্বল রহিয়াছে।

খনার জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং লীলাবতীর গণিত শাস্ত্রে অগাধ পারদর্শিতা ছিল। অনেক মহাত্মার ধারণা যে, আমাদের দেশে নারীজাতি উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত ছিল। খনা এবং লীলাবতীর জীবন তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাদৃশ প্রদীপ্ত প্রতিভাশালিনী নারীদ্বয়ের জীবন কথা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আমাদের মন স্বভাবতঃই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জীবন-চরিত অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এই ঘোর অন্ধকার দুর করিবার কোন উপায় নাই। ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল কিম্বদন্তীর অনেকগুলিই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

---

* ভারত-মহিলা নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধমহিলা হইতে রুক্মাবতীর কথা উদ্ধৃত হইল। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শাস্ত্রীমহাশয়ের ঠিকানা জানিতে না পারায় অনুমতি লইতে পারি নাই।

খনা চিরখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার অন্যতম রত্ন মিহিরের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই শৈশব এবং বাল্যকাল এক সঙ্গে অনার্য্যজাতির আশ্রয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল; তাঁহারা উভয়েই এক সঙ্গে অনার্য্যদের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন।

আর্য্যা খনা কোন স্বত্রে শৈশবকালে পিতামাতার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনার্য্যালয়ে নীত হইয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু মিহির সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, তদীয় পিতা মহামহোপাধ্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ বরাহ পুত্রের জন্ম মাত্র তাহার আয়ুষ্কাল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন এবং গণনার ভুল বশতঃ একশত বৎসর স্থানে দশ বৎসর মাত্র আয়ুঃ অবধারণ করেন। এজন্য বরাহ সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন এবং মাত্র দশ বৎসরের জন্য স্নেহপাশে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হন। অতঃপর তিনি পুত্রকে মৃৎ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেন। একজন অনার্য্যা রমণী দৈবাৎ শিশুকে দেখিতে পায়; শিশুর সুন্দর মুখ তাহার হৃদয় স্নেহসিক্ত করিয়া তুলে; রমণী তাহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করে।

ভারতরত্ন মিহির কিরূপে অনার্য্যগৃহে নীত হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইল। এই অনার্য্যবাসে খনার সঙ্গে তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বাল-সুলভ সখ্য ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। তাদৃশ অভিনব ভাবের আবির্ভাবে তাঁহাদের হৃদয় পুলকাবিষ্ট হইয়া উঠে; তাঁহারা পরিণয় স্বত্রে সম্মিলিত হন।

নবীন দম্পতি বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনাদিগকে আর্য্যবংশ সম্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং গণনা দ্বারা আপনাদের পিতৃমাতৃকুলের পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়া জন্মভূমি

দর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ লাভ জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অশেষ সুখস্মৃতি জড়িত আশ্রয় স্থল এবং স্নেহশীল প্রতিপালকদিগকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে জন্মভূমি দর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষাই জয়লাভ করিল, তাঁহারা অনার্য্যদের নিকট হইতে বাষ্পাকুললোচনে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনার্য্যগণ তাঁহাদের অদর্শনের কল্পনায় ক্লিষ্ট হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিলেন, মিহির ও খনা তাহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের হৃদয়ানন্দ মিহির ও খনার মঙ্গল কামনা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মিহির ও খনা আগত হইলে বরাহ পুত্র এবং পুত্রবধূর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বরাহ পুত্র মিহিরকে রাজ সভায় উপস্থিত করিলেন; মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন; রাজাদেশে মিহির সভারত্নরূপে আসন পরিগ্রহ করিলেন। বরাহ নিজে সভারত্ন ছিলেন; তদুপরি পুত্রের রাজ-প্রসাদ লাভ সাতিশয় আনন্দের কারণ হইল। খনা রাজ সভার ভূষণ স্বরূপ শ্বশুর ও স্বামীর আশ্রয়ে বাস করিয়া পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানালোচনায় সহায় স্বরূপিনী হইলেন। কিন্তু শ্বশুর ও স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানালোচনার সূত্র অবলম্বন করিয়াই খনার সুখ রাশিতে কীট প্রবেশ করিল। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে শ্বশুর ও স্বামী অপেক্ষা অধিক পারদর্শিনী ছিলেন। খনা সময় সময় শ্বশুরের গণনা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বরাহের হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল।

এই সময় একদা বরাহ আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা নির্দ্ধারণ জন্য

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বরাহ নিজে এই গণনা করিতে অসমর্থ হইয়া পুত্র বধূ খনাকে উহার ভার অর্পণ করিলেন। খনা শ্বশুরের আদেশানুসারে গণনা পূর্ব্বক আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা অবধারণ করিয়া দিলেন। বরাহ যথা সময়ে রাজ সভায় গমন পূর্ব্বক মহারাজাকে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা পরিজ্ঞাত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাদৃশ অদ্ভুত গণনা শক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তৎকালে খনার বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল। তিনি খনাকেই গণনাকারিণী বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা আপন অনুমান যথার্থ বলিয়া জানিতে পারিলেন। গুণমুগ্ধ বিক্রমাদিত্য মনস্বিনী খনার দর্শন লাভ জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং কৌতুহলের আতিশয্য বশতঃ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহাকে রাজ সভায় আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই আদেশ প্রতিপালন করিলে কুলমর্য্যাদা নাশ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া বরাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পুত্রবধূর অসাধারণ গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিয়াছিল, এক্ষণ কুলমর্য্যাদা নাশ ভয় তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। বরাহ খনার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া শান্তিলাভের সংকল্প করিলেন এবং পুত্র মিহিরকে তদনুরূপ আদেশ দিলেন।

পিতার তাদৃশ অমানুষিক আদেশ শ্রবণে মিহিরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পদতলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বরাহের সংকল্প ও আদেশের বিষয় খনার কর্ণগোচর হইলে তাঁহার জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইল ; তিনি জীবন ভার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ জীবন পদ্মপত্র স্থিত জলবিম্বের ন্যায় অস্থির, পূজ্যপাদ শ্বশুরের হৃদয় শান্ত করিবার জন্য এই নশ্বর দেহ পাত করিতে পারিলে তাহা পরম ফলোপধায়ক হইত। অতএব সত্বরে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কর।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মিহির উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; তিনি খনার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া চিরদিনের জন্য আপন নাম কলঙ্কিত করিলেন।

খনার তিরোভাবের পর কত কাল,—কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি লোকে তাঁহার বচন আবৃত্তি করিয়া থাকে। এই সকল বচন অভিজ্ঞতালব্ধ ও জ্ঞানগর্ভ। তৎসমুদয় পাঠে আমরা বর্ষা ও কৃষি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারি। কিম্বদন্তী বিদুষী খনাকে এই সকল বচনের রচয়িত্রী রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু উজ্জয়িনীবাসিনী বিদুষীর বচন বাঙ্গলা ভাষায় গ্রথিত দেখিয়া আমাদের মান সহজেই দ্বিধা উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ এই সকল বচন উজ্জয়িনীর ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল, তারপর বাঙ্গালী জাতি তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছে। খনার বচনের কতকগুলি হিন্দি মিশ্রিত, এজন্য যে প্রক্রিয়ায় খনার বচন রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইতে পারে। খনার বচন সাহিত্যের হিসাবে সৌষ্ঠবশালী না হইলেও আলোচনার যোগ্য ; তাদৃশ আলোচনা গৃহস্থ ও কৃষক কুলের হিতজনক। *

---

* আমরা এখানে খনার কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যদি বর্ষে অঘনে, রাজা যান মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষে টাকা হয় তুঁষে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে ফাগুনে, চিনা কাউন দ্বিগুণে।
চৈত্রে থর থর, বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠে শুখা, আষাঢ়ে ধারা।
শস্যের ভার না সহে ধরা।
কর্কট ছরকট, সিংহ শুখা
কন্যা কানেকান।

খনার তুলনায় লীলাবতীর আবির্ভাব কাল আধুনিক। লীলাবতী ভারত ভূষণ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। ভাস্করাচার্য্যের সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আলোচনা করিয়া পুরাতত্ত্বজ্ঞ বেটলি সাহেব নির্দ্দেশ

বিনা বায়ে তুলা বর্ষে,
কোথা রাখ্‌বে ধান।
অগহন্‌ যে বর্‌ষে মেঘ্‌,
ধন্য রাজা ধন্য দেশ।
অগহন্‌ দোবর্‌, পুষ্‌ দেড়া,
মাঘ্‌ সয়াই, ফাগুন্‌ বর্‌ষে ঘরহুকে যাই।
পানি বর্‌ষে আধা পুষ্‌,
আধা গেঁহু আধা ভুষ্‌।
বর্ষে যদি মকরে।
চাষ হবে টিকরে॥
মাঘে যদি বর্ষে দেবা।
তবে হয় প্রজার সেবা॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষা।
ধন্য সে রাজা ধন্য সে দেশা॥
যোঁ বর্‌ষে বৈশাখা রাউ।
এক ধান্‌মে দোবর চাউ॥
জ্যৈষ্ঠে মারে, আষাঢ়ে ভরে।
কাটিয়া মাড়িয়া ঘরে পুরে॥
জ্যৈষ্ঠেতে ফুটে তারা।
আষাঢ়ে ভর্‌বে গাড়া॥
অরদরা বরষে সভ্‌ কিছু হাঁ।
এক জবাস্‌ পতর্‌ বিন্‌ভাঁ॥
একো পানি যোঁ বরষে সাতি।
কুর্‌মি পহিরে সোণা পাতি।

করিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ ভাস্করাচার্য্যকে অধিকতর প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

সুকিলা শ্রাবণ, ধুলিয়া ভাদুয়া।
আশ্বিন মাসেরে না লাগে কাদুয়া॥
কার্ত্তিক মাসেরে বা বরসা।
ক্ষেত ছাড়ি কিরি পলায় চাষা॥
কার্ত্তিক মাসেরে ডগুারে পানি।
হাটুয়া কাড়িবে বড় গৌনি॥
আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা।
পাহাড়ে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভরে কাঁপে মেদিনী॥
হেসে সূর্য্য বসেন পাটে।
চাষার বলদ বিকায় হাটে॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
এলো মেলো বহে বা।
কৃষককে বল বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥
আউয়া বাউয়া বহে বতাস্।
তব হোলা বর্ষা কে আশ্॥
বৎসরের প্রথমে ঈশানে বয়।
সেই বৎসর বড় বর্ষা হয়॥

ভারতললামভূতা বারানসী ভাস্করাচার্য্যের বাসভূমি ছিল। তদীয় কন্যা লীলাবতীর জীবনও এই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়।
সে দিন বড় বর্ষা হয়॥
শ্রাবণ ভাদ্রে বহে ঈশান।
কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ॥
ভাদুরে মেঘে পূবে বায়।
সে দিন বড় বর্ষা হয়॥
জোঁ পূরবা পূরবৈয়া পাবে।
সুখলে নদিয়া নাউ বহাবে॥
সাওন পাছেয়া মহি ভরে।
ভাদো পূরবা পথল সরে॥
শ্রাবণে বয় পূবে বায়।
হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়॥
আষাঢ় সাওন বহে পূর্বিয়া।
বেচ বরদ কেন গাইয়া॥
সাওন কে পুরৌয়া, ভাদন্ পচ্ছিমা জোর।
বরখা বৈঁচ স্বামী, চল দেশ কা ওর।
পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণে বয়।
সেই বৎসর বন্যা হয়॥
বেঙ্ ডাকে ঘন ঘন।
জল হবে শীঘ্র জান॥
বেঙ্ ঘন ঘন ডাকিলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়।
চন্দ্র মণ্ডলের মধ্যে তারা।
জল বর্ষে মুষল ধারা॥

লীলাবতী বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হন এবং পিতার উৎসাহে গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তদালোচনায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। লীলাবতীর অকাল বৈধব্য সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভাস্করাচার্য্য গণনা দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যার অদৃষ্ট লিপি অবগত হন। অকাল বৈধব্য তাহার অদৃষ্টে লিখিত ছিল। একটি শুভলগ্নে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অকাল বৈধব্য অসম্ভব বলিয়া ভাস্করাচার্য্যের বিশ্বাস ছিল। ভাস্করাচার্য্য এই লগ্নে বিবাহ দিয়া প্রিয়তমা কন্যার অকাল বৈধব্য নিবারণ করিতে সঙ্কল্প করেন। লগ্ন অবধারণ জন্য বিবাহ সভায় বর কন্যার সম্মুখে জল যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই যন্ত্র অর্থাৎ পাত্র

দূর সভা নিকট জল।
নিকট সভা রসাতল ॥
পূবেতে উঠিল কাড়।
ডগ্গা ডোবা একাকার ॥
পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা।
পূবের ধনু বর্ষে ঝরা ॥
কাতির পূর্ণিমা কর আশা।
খনা বলে শোন্‌রে চাষা ॥
নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়।
রবি খন্দের ভার ধরা না সয় ॥
মেঘে করে রাত্রে আর হয় জল।
তবে জেন মাঠে যাওয়াই বিফল ॥
পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।
য দিন কুয়া ত দিন জল ॥
পৌষ গরমী বৈশাখে জাড়।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড় ॥

জল পূর্ণ ছিল, তাহাতে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল, এই ছিদ্র পথে পাত্রস্থিত সমস্ত জল নিঃশেষ হইয়া বহির্গত হইবার মুহূর্ত্তই সেই শুভ লগ্ন ছিল। সভাস্থ দর্শক বৃন্দ সোৎসুক নেত্রে শুভ লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দৈবাৎ লীলাবতীর অলঙ্কার হইতে একটি মুক্তা জল যন্ত্রে পতিত হইয়া ছিদ্র পথ রুদ্ধ করে এবং তজ্জন্য লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে পুরুষকার বলে অদৃষ্ট লিপি খণ্ডনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

মাঘ্‌কে গর্‌মী, জেঠ্‌ জাড়্‌।
পহিলা পানি ভর্‌ গৈল্‌ তাড়্‌॥
ঘাঘ্‌ কহে হাম্‌ হোবোঁ যোগী।
কুয়াকা পানি ধোই হে ধোবী॥

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে কিন্‌তে না পান ধান॥

শ্রাবণ ধুই, বাধুই নহি।
ভাদ্রব ধুই, কিছু কিছু রহি।
আশ্বিন ধুই, সর্ব্বস্ব যাহি॥
দিনে জল রাতে তারা।
এই দেখবে শুখার ধারা॥
বাদল বামুন বান।
দক্ষিণে পেলেই যান॥
রাত নিবদ্দর দিনকে ছয়া।
কহে ঘাঘ্‌ যে বরখা গয়া॥
বোলি লুকৃরি, ফুলে কাশ্‌।
আব্‌ নাহিন্‌ বরখা কে আশ্‌॥

ভাস্করাচার্য্য এই ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া বলেন, আমি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা তোমার নামানুসারে লীলাবতী নামে অভিহিত করিব। এই গ্রন্থ সময়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, কীর্ত্তি দ্বিতীয় জীবন তুল্য, তোমার ইহ জীবন ব্যর্থ হইল, কিন্তু এই দ্বিতীয় জীবন চিরস্থায়ী হইয়া সফল হইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গণিত এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা লীলাবতী নামে অভিহিত করেন।

এই বিবরণ কবি বিরচিত উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার মূলে সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা লীলাবতীর কাহিনীতে পুত্রীর মঙ্গলার্থ পিতার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং যত্নের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ভাস্করাচার্য্য কন্যার বৈধব্যদুঃখপীড়িত জীবনে শান্তি আনয়ন উদ্দেশ্যে বিপুল আয়াস সহকারে তাঁহাকে গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁহার এরূপ দক্ষতা হইয়াছিল যে, তিনি দর্শন মাত্র বৃক্ষের পত্র এবং ফল সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিতেন। গণিত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু Equation বিদ্যার সমাধানে এইরূপ গণনা যে সম্ভবপর, তাহা গণিতশাস্ত্রদর্শী মাত্রেই অবগত আছেন। লীলাবতী গ্রন্থ পিতা পুত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। এই গ্রন্থ ভারতীয় পাটীগণিত শাস্ত্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আকবরের অন্যতম প্রধান অমাত্য ফৈজী পারস্য ভাষায় লীলাবতীর অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ভাষাতেও লীলাবতী অনূদিত হইয়াছে। অনুবাদ কর্ত্তার নাম ডাক্তার টেইলার এবং মিষ্টার কোলব্রুক।

জয়মতী

(পতি ভক্তি)

আসামের নরপতি চক্রধ্বজ সিংহের রাজত্ব কালে দুরাকাঙ্ক্ষ ও স্বার্থপর মন্ত্রীবৃন্দ শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করিয়া অখণ্ড প্রভুত্ব সংস্থাপন করিবার উদ্যোগী হন এবং তদর্থ রাজাকে হত্যা করিয়া একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এই নবীন রাজা প্রজা মণ্ডলী মধ্যে লরা নামে পরিচিত ছিলেন। লরা শব্দের অর্থ বালক।

লরা রাজা দুর্ব্বল চিত্ত এবং অকর্ম্মণ্য ছিলেন; এজন্য তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াও রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে অসমর্থ হন; দুরকাঙ্ক্ষ এবং স্বার্থপর মন্ত্রীবৃন্দই পূর্ব্ববৎ তাঁহার নামে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি কেবল বিলাস ব্যসনে, প্রজা পীড়নে এবং স্ববংশীয়দের ধ্বংস সাধনে নিরত থাকিতেন। তাঁহার ভোগৈশ্বর্য্যের সংস্থান জন্য বহু প্রজার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল; তাঁহার রাজ পদের বিঘ্ন নাশ জন্য রাজবংশীয়দের রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহার ক্রূরাচরণে চারিদিকে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল।

সতী জয়মতীর জীবন নাশ রাজা লরার অসংখ্য পাপাচরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মান্তিক। জয়মতীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় যুগপৎ ঘৃণায় আকুল ও প্রীতিতে আপ্লুত হইয়া থাকে। লরা রাজার অমানুষিক স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা দর্শন করিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হই, আর জয়মতীর অপূর্ব্ব পতিপ্রেম ও সহিষ্ণুতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। আমরা এখানে জয়মতীর করুণ কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জয়মতী আসামের রাজকুলে পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পতির নাম গদাপাণি। গদাপাণির বাহুতে অসীম শক্তি, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি ছিল। তিনি গার্হস্থ্য সুখের প্রয়াসী ছিলেন; রাজ্য লালসা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। গদাপাণি পর্ণ কুটীরে পত্নী জয়মতী এবং দুইটি শিশু পুত্র লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গদাপাণির অলোকসামান্য গুণরাজি তাঁহাকে সাতিশয় লোকপ্রিয় করিয়াছিল। এই লোকপ্রিয়তাই সর্ব্বনাশের কারণ হইল। রাজা লরা লোকপ্রিয় গদাপাণিকে আপনার রাজপদের কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিলেন; তাঁহার হত্যার জন্য ঘাতক নিযুক্ত হইল।

দশ বার জন রাজানুচর গদাপাণিকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। গদাপাণি প্রবল বিক্রমে তাহাদের প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার তিনি সন্তরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইয়া আততায়ীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। রাজানুচরেরা পথে ঘাটে, সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল; প্রতি পাদক্ষেপে তাঁহার জীবন বিঘ্ন সঙ্কুল হইতে লাগিল।

এইভাবে দীর্ঘ দিন আত্মরক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া জয়মতী তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বলিলেন। তেজস্বী বীরপুরুষ গদাপাণি প্রিয়তমা পত্নীর এই প্রস্তাবে মর্ম্মাহত হইলেন এবং পুত্র কলত্র অসহায়াবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু জয়মতী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে রাজার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার সামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে গদাপাণি পত্নীর ব্যাকুল হৃদয়ের অনুরোধ

উপেক্ষা করিতে না পারায় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ভগবানের হস্তে স্ত্রীপুত্র সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বাষ্পাকুল লোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি নাগা পর্ব্বতের দুর্গম প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

রাজানুচরবর্গ বহু অনুসন্ধানেও গদাপাণির সংবাদ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার পলায়ন বৃত্তান্ত লরা রাজাকে পরিজ্ঞাত করিল। তিনি এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, জয়মতীর নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজ সভায় আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল।

বীর নারী জয়মতী রাজসভায় উপস্থিত হইলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার তেজস্বিতাব্যঞ্জক দীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সতীত্বের জ্বলন্ত প্রভা পাষাণ হৃদয় লরা রাজাকে বিগলিত করিতে অসমর্থ হইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে জয়মতীকে তাঁহার স্বামীর অবস্থানের বিষয় প্রশ্ন করিলেন। সত্য-বাদিনী তেজস্বিনী জয়মতী তাদৃশ সঙ্কট কালেও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব না। রাজপুরুষগণ কখনও প্রলোভন, কখনও বা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী সতী সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আপন সংকল্পে অটল রহিলেন। প্রলোভন এবং ভয় প্রদর্শন বিফল হওয়াতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। পাপিষ্ঠ রাজানুচরবর্গ তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া কাষ্ঠ দণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। এইভাবে পক্ষাধিক কাল অতিবাহিত হইল; আদর্শ সতী প্রাণাধিক স্বামীর প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত যন্ত্রণা অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন। পত্নীর প্রতি এই ভীষণ

অত্যাচারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া গদাপাণি অজ্ঞাতবাসে অস্থির হইয়া পড়িলেন; তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া পত্নীর উদ্ধার সাধন মানসে তাঁহার নিকট ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেন। পতিপ্রাণা সতী ছদ্মবেশ সত্ত্বেও পতিকে দর্শন মাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে অচিরে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মরণাহতা পত্নীর এই শেষ প্রার্থনা উপেক্ষা করিলে মৃত্যুকালে তাঁহার মনের শান্তি অন্তর্হিত হইবে বুঝিতে পারিয়া গদাপাণি আত্মপ্রকাশের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। তারপর তিনি অতৃপ্তলোচনে পত্নীর কাতর মুখমণ্ডল শেষবারের জন্য দেখিয়া লইয়া উন্মাদের ন্যায় তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন পতিপ্রাণা জয়মতী উদ্বেগশূন্য চিত্তে স্বামীর হিতার্থ জীবনের পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। রাজানুচরদের ষোড়শ দিবস ব্যাপী অমানুষিক উৎপীড়নে তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল; পৃথিবীতে পতিপ্রেম ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময় লরা রাজা এবং তদীয় অমাত্যবর্গের পাপের মাত্রা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাদের অত্যাচার উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদিগকে বিদূরিত করিয়া গদাপাণিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তদীয় পুত্র রুদ্র সিংহ জননীর পুণ্য অবদান স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার জীবন নাশ স্থলে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহার তীরে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এই দীর্ঘিকা এবং দেবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া পাতিব্রত্য এবং মাতৃভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সর্ব্বসাধারণের নিকট দীর্ঘিকা জয়সাগর এবং দেবমন্দির জয়দোল নামে পরিচিত।

দর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ লাভ জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অশেষ সুখস্মৃতি জড়িত আশ্রয় স্থল এবং স্নেহশীল প্রতিপালকদিগকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে জন্মভূমি দর্শন ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষাই জয়লাভ করিল, তাঁহারা অনার্য্যদের নিকট হইতে বাষ্পাকুললোচনে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনার্য্যগণ তাঁহাদের অদর্শনের কল্পনায় ক্লিষ্ট হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিলেন, মিহির ও খনা তাহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের হৃদয়ানন্দ মিহির ও খনার মঙ্গল কামনা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মিহির ও খনা আগত হইলে বরাহ পুত্র এবং পুত্রবধূর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বরাহ পুত্র মিহিরকে রাজ সভায় উপস্থিত করিলেন; মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন; রাজাদেশে মিহির সভারত্নরূপে আসন পরিগ্রহ করিলেন। বরাহ নিজে সভারত্ন ছিলেন; তদুপরি পুত্রের রাজ-প্রসাদ লাভ সাতিশয় আনন্দের কারণ হইল। খনা রাজ সভার ভূষণ স্বরূপ শ্বশুর ও স্বামীর আশ্রয়ে বাস করিয়া পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানালোচনায় সহায় স্বরূপিনী হইলেন। কিন্তু শ্বশুর ও স্বামীর সঙ্গে জ্ঞানালোচনার সূত্র অবলম্বন করিয়াই খনার সুখ রাশিতে কীট প্রবেশ করিল। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে শ্বশুর ও স্বামী অপেক্ষা অধিক পারদর্শিনী ছিলেন। খনা সময় সময় শ্বশুরের গণনা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বরাহের হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল।

এই সময় একদা বরাহ আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা নির্দ্ধারণ জন্য

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বরাহ নিজে এই গণনা করিতে অসমর্থ হইয়া পুত্র বধূ খনাকে উহার ভার অর্পণ করিলেন। খনা শ্বশুরের আদেশানুসারে গণনা পূর্ব্বক আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা অবধারণ করিয়া দিলেন। বরাহ যথা সময়ে রাজ সভায় গমন পূর্ব্বক মহারাজাকে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা পরিজ্ঞাত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাদৃশ্য অদ্ভুত গণনা শক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তৎকালে খনার বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল। তিনি খনাকেই গণনাকারিণী বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা আপন অনুমান যথার্থ বলিয়া জানিতে পারিলেন। গুণমুগ্ধ বিক্রমাদিত্য মনস্বিনী খনার দর্শন লাভ জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং কৌতুহলের আতিশয্য বশতঃ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহাকে রাজ সভায় আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই আদেশ প্রতিপালন করিলে কুলমর্য্যাদা নাশ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া বরাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পুত্রবধূর অসাধারণ গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিয়াছিল, এক্ষণ কুলমর্য্যাদা নাশ ভয় তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। বরাহ খনার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া শান্তিলাভের সংকল্প করিলেন এবং পুত্র মিহিরকে তদনুরূপ আদেশ দিলেন।

পিতার তাদৃশ অমানুষিক আদেশ শ্রবণে মিহিরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার পদতলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বরাহের সংকল্প ও আদেশের বিষয় খনার কর্ণগোচর হইলে তাঁহার জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইল ; তিনি জীবন ভার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ জীবন পদ্মপত্র স্থিত জলবিম্বের ন্যায় অস্থির, পূজ্যপাদ শ্বশুরের হৃদয় শান্ত করিবার জন্য এই নশ্বর দেহ পাত করিতে পারিলে তাহা পরম ফলোপধায়ক হইত। অতএব সত্বরে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কর।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মিহির উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; তিনি খনার জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া চিরদিনের জন্য আপন নাম কলঙ্কিত করিলেন।

খনার তিরোভাবের পর কত কাল,—কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি লোকে তাঁহার বচন আবৃত্তি করিয়া থাকে। এই সকল বচন অভিজ্ঞতালব্ধ ও জ্ঞানগর্ভ। তৎসমুদয় পাঠে আমরা বর্ষা ও কৃষি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারি। কিম্বদন্তী বিদুষী খনাকে এই সকল বচনের রচয়িত্রী রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু উজ্জয়িনীবাসিনী বিদুষীর বচন বাঙ্গলা ভাষায় গ্রথিত দেখিয়া আমাদের মান সহজেই দ্বিধা উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ এই সকল বচন উজ্জয়িনীর ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল, তারপর বাঙ্গালী জাতি তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছে। খনার বচনের কতকগুলি হিন্দি মিশ্রিত, এজন্য যে প্রক্রিয়ায় খনার বচন রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইতে পারে। খনার বচন সাহিত্যের হিসাবে সৌষ্ঠবশালী না হইলেও আলোচনার যোগ্য ; তাদৃশ আলোচনা গৃহস্থ ও কৃষক কুলের হিতজনক। *

---

* আমরা এখানে খনার কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যদি বর্ষে অঘনে, রাজা যান মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষে টাকা হয় তুঁষে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে ফাগুনে, চিনা কাউন দ্বিগুণে।
চৈত্রে থর থর, বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠে শুখা, আষাঢ়ে ধারা।
শস্যের ভার না সহে ধরা।
কর্কট ছরকট, সিংহ শুখা
কন্যা কানেকান।

খনার তুলনায় লীলাবতীর আবির্ভাব কাল আধুনিক। লীলাবতী ভারত ভূষণ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। ভাস্করাচার্য্যের সূর্য্য সিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আলোচনা করিয়া পুরাতত্ত্বজ্ঞ বেটলি সাহেব নির্দ্দেশ

বিনা বায়ে তুলা বর্ষে,
কোথা রাখ্‌বে ধান।
অগহন্‌ যে বর্‌ষে মেঘ্‌,
ধন্য রাজা ধন্য দেশ।
অগহন্‌ দোবর্‌, পুষ্‌ দেড়া,
মাঘ্‌ সয়াই, ফাগুন্‌ বর্‌ষে ঘরহুকে যাই।
পানি বর্‌ষে আধা পুষ্‌,
আধা গেঁহু আধা ভুষ্‌।
বর্ষে যদি মকরে।
চাষ হবে টিকরে॥
মাঘে যদি বর্ষে দেবা।
তবে হয় প্রজার সেবা॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষা।
ধন্য সে রাজা ধন্য সে দেশা॥
যোঁ বর্‌ষে বৈশাখা রাউ।
এক ধান্‌মে দোবর চাউ॥
জ্যৈষ্ঠে মারে, আষাঢ়ে ভরে।
কাটিয়া মাড়িয়া ঘরে পুরে॥
জ্যৈষ্ঠেতে ফুটে তারা।
আষাঢ়ে ভর্‌বে গাড়া॥
অরদরা বরষে সভ্‌ কিছু হাঁ।
এক জবাস্‌ পতর্‌ বিন্‌ভাঁ॥
একো পানি যোঁ বরষে সাতি।
কুর্‌মি পহিরে সোণা পাতি।

করিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ ভাস্করাচার্য্যকে অধিকতর প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

শুকিলা শ্রাবণ, ধুলিয়া ভাদুয়া।
আশ্বিন মাসেরে না লাগে কাদুয়া॥
কার্ত্তিক মাসেরে বা বরসা।
ক্ষেত ছাড়ি কিরি পলায় চাষা॥
কার্ত্তিক মাসেরে ডণ্ডারে পানি।
হাটুয়া কাড়িবে বড় গৌনি॥
আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা।
পাহাড়ে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভরে কাঁপে মেদিনী॥
হেসে সূর্য্য বসেন পাটে।
চাষার বলদ বিকায় হাটে॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
এলো মেলো বহে বা।
কৃষককে বল বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥
আউয়া বাউয়া বহে বতাস্।
তব হোলা বর্ষা কে আশ্॥
বৎসরের প্রথমে ঈশানে বয়।
সেই বৎসর বড় বর্ষা হয়॥

ভারতললামভূতা বারানসী ভাস্করাচার্য্যের বাসভূমি ছিল। তদীয় কন্যা লীলাবতীর জীবনও এই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়।
সে দিন বড় বর্ষা হয়॥
শ্রাবণ ভাদ্রে বহে ঈশান।
কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ॥
ভাদুরে মেঘে পূবে বায়।
সে দিন বড় বর্ষা হয়॥
জোঁ পূরবা পূরবৈয়া পাবে।
সুখলে নদিয়া নাউ বহাবে॥
সাওন পাছেয়া মহি ভরে।
ভাদো পূরবা পথল সরে॥
শ্রাবণে বয় পূবে বায়।
হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়॥
আষাঢ় সাওন বহে পূর্বিয়া।
বেচ বরদ কেন গাইয়া॥
সাওন কে পুরৌয়া, ভাদন্ পচ্ছিমা জোর।
বরষা বৈঁচ স্বামী, চল দেশ কা ওর।
পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণে বয়।
সেই বৎসর বন্যা হয়॥
বেঙ্ ডাকে ঘন ঘন।
জল হবে শীঘ্র জান॥
বেঙ্ ঘন ঘন ডাকিলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়।
চন্দ্র মণ্ডলের মধ্যে তারা।
জল বর্ষে মুষল ধারা॥

লীলাবতী বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হন এবং পিতার উৎসাহে গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তদালোচনায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। লীলাবতীর অকাল বৈধব্য সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভাস্করাচার্য্য গণনা দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যার অদৃষ্ট লিপি অবগত হন। অকাল বৈধব্য তাহার অদৃষ্টে লিখিত ছিল। একটি শুভলগ্নে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অকাল বৈধব্য অসম্ভব বলিয়া ভাস্করাচার্য্যের বিশ্বাস ছিল। ভাস্করাচার্য্য এই লগ্নে বিবাহ দিয়া প্রিয়তমা কন্যার অকাল বৈধব্য নিবারণ করিতে সঙ্কল্প করেন। লগ্ন অবধারণ জন্য বিবাহ সভায় বর কন্যার সম্মুখে জল যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই যন্ত্র অর্থাৎ পাত্র

দূর সভা নিকট জল।
নিকট সভা রসাতল ॥
পূবেতে উঠিল কাড়।
ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥
পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা।
পূবের ধনু বর্ষে ঝরা ॥
কাতির পূর্ণিমা কর আশা।
খনা বলে শোনরে চাষা ॥
নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়।
রবি খন্দের ভার ধরা না সয় ॥
মেঘে করে রাত্রে আর হয় জল।
তবে জেন মাঠে যাওয়াই বিফল ॥
পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।
য দিন কুয়া ত দিন জল ॥
পৌষ গরমী বৈশাখে জাড়।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড় ॥

জল পূর্ণ ছিল, তাহাতে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল, এই ছিদ্র পথে পাত্রস্থিত সমস্ত জল নিঃশেষ হইয়া বহির্গত হইবার মুহূর্ত্তই সেই শুভ লগ্ন ছিল। সভাস্থ দর্শক বৃন্দ সোৎসুক নেত্রে শুভ লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দৈবাৎ লীলাবতীর অলঙ্কার হইতে একটি মুক্তা জল যন্ত্রে পতিত হইয়া ছিদ্র পথ রুদ্ধ করে এবং তজ্জন্য লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে পুরুষকার বলে অদৃষ্ট লিপি খণ্ডনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

মাঘ্কে গর্মী, জেঠ্ জাড়্।
পহিলা পানি ভর্ গৈল্ তাড়্॥
ঘাঘ্ কহে হাম্ হোবোঁ যোগী।
কুয়াকা পানি ধোই হে ধোবী॥

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে কিন্‌তে না পান ধান॥

শ্রাবণ ধুই, বাধুই নহি।
ভাদ্রব ধুই, কিছু কিছু রহি।
আশ্বিন ধুই, সর্ব্বস্ব যাহি॥
দিনে জল রাতে তারা।
এই দেখবে শুখার ধারা॥
বাদল বামুন বান।
দক্ষিণে পেলেই যান॥
রাত নিবদ্দর দিনকে ছয়া।
কহে ঘাঘ্ যে বরখা গয়া॥
বোলি লুকৃরি, ফুলে কাশ্।
আব্ নাহিন্ বরখা কে আশ্॥

ভাস্করাচার্য্য এই ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া বলেন, আমি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা তোমার নামানুসারে লীলাবতী নামে অভিহিত করিব। এই গ্রন্থ সময়ের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, কীর্ত্তি দ্বিতীয় জীবন তুল্য, তোমার ইহ জীবন ব্যর্থ হইল, কিন্তু এই দ্বিতীয় জীবন চিরস্থায়ী হইয়া সফল হইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গণিত এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা লীলাবতী নামে অভিহিত করেন।

এই বিবরণ কবি বিরচিত উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার মূলে সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা লীলাবতীর কাহিনীতে পুত্রীর মঙ্গলার্থ পিতার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং যত্নের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ভাস্করাচার্য্য কন্যার বৈধব্যদুঃখপীড়িত জীবনে শান্তি আনয়ন উদ্দেশ্যে বিপুল আয়াস সহকারে তাঁহাকে গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁহার এরূপ দক্ষতা হইয়াছিল যে, তিনি দর্শন মাত্র বৃক্ষের পত্র এবং ফল সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিতেন। গণিত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু Equation বিদ্যার সমাধানে এইরূপ গণনা যে সম্ভবপর, তাহা গণিতশাস্ত্রদর্শী মাত্রেই অবগত আছেন। লীলাবতী গ্রন্থ পিতা পুত্রীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। এই গ্রন্থ ভারতীয় পাটীগণিত শাস্ত্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আকবরের অন্যতম প্রধান অমাত্য ফৈজী পারস্য ভাষায় লীলাবতীর অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ভাষাতেও লীলাবতী অনূদিত হইয়াছে। অনুবাদ কর্ত্তার নাম ডাক্তার টেইলার এবং মিষ্টার কোলব্রুক।

জয়মতী

(পতি ভক্তি)

আসামের নরপতি চক্রধ্বজ সিংহের রাজত্ব কালে দুরাকাঙ্ক্ষ ও স্বার্থপর মন্ত্রীবৃন্দ শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করিয়া অখণ্ড প্রভুত্ব সংস্থাপন করিবার উদ্যোগী হন এবং তদর্থ রাজাকে হত্যা করিয়া একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এই নবীন রাজা প্রজা মণ্ডলী মধ্যে লরা নামে পরিচিত ছিলেন। লরা শব্দের অর্থ বালক।

লরা রাজা দুর্ব্বল চিত্ত এবং অকর্ম্মণ্য ছিলেন; এজন্য তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াও রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে অসমর্থ হন; দুরকাঙ্ক্ষ এবং স্বার্থপর মন্ত্রীবৃন্দই পূর্ব্ববৎ তাঁহার নামে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি কেবল বিলাস ব্যসনে, প্রজা পীড়নে এবং স্ববংশীয়দের ধ্বংস সাধনে নিরত থাকিতেন। তাঁহার ভোগৈশ্বর্য্যের সংস্থান জন্য বহু প্রজার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল; তাঁহার রাজ পদের বিঘ্ন নাশ জন্য রাজবংশীয়দের রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহার ক্রূরাচরণে চারিদিকে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল।

সতী জয়মতীর জীবন নাশ রাজা লরার অসংখ্য পাপাচরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মান্তিক। জয়মতীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় যুগপৎ ঘৃণায় আকুল ও প্রীতিতে আপ্লুত হইয়া থাকে। লরা রাজার অমানুষিক স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা দর্শন করিয়া আমরা ক্ষুব্ধ হই, আর জয়মতীর অপূর্ব্ব পতিপ্রেম ও সহিষ্ণুতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। আমরা এখানে জয়মতীর করুণ কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জয়মতী আসামের রাজকুলে পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পতির নাম গদাপাণি। গদাপাণির বাহুতে অসীম শক্তি, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি ছিল। তিনি গার্হস্থ্য সুখের প্রয়াসী ছিলেন; রাজ্য লালসা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। গদাপাণি পর্ণ কুটীরে পত্নী জয়মতী এবং দুইটি শিশু পুত্র লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গদাপাণির অলোকসামান্য গুণরাজি তাঁহাকে সাতিশয় লোকপ্রিয় করিয়াছিল। এই লোকপ্রিয়তাই সর্ব্বনাশের কারণ হইল। রাজা লরা লোকপ্রিয় গদাপাণিকে আপনার রাজপদের কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিলেন; তাঁহার হত্যার জন্য ঘাতক নিযুক্ত হইল।

দশ বার জন রাজানুচর গদাপাণিকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। গদাপাণি প্রবল বিক্রমে তাহাদের প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার তিনি সন্তরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইয়া আততায়ীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। রাজানুচরেরা পথে ঘাটে, সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল; প্রতি পাদক্ষেপে তাঁহার জীবন বিঘ্ন সঙ্কুল হইতে লাগিল।

এইভাবে দীর্ঘ দিন আত্মরক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া জয়মতী তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বলিলেন। তেজস্বী বীরপুরুষ গদাপাণি প্রিয়তমা পত্নীর এই প্রস্তাবে মর্ম্মাহত হইলেন এবং পুত্র কলত্র অসহায়াবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু জয়মতী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কালে রাজার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার সামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে গদাপাণি পত্নীর ব্যাকুল হৃদয়ের অনুরোধ

উপেক্ষা করিতে না পারায় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ভগবানের হস্তে স্ত্রীপুত্র সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বাষ্পাকুল লোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি নাগা পর্ব্বতের দুর্গম প্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

রাজানুচরবর্গ বহু অনুসন্ধানেও গদাপাণির সংবাদ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার পলায়ন বৃত্তান্ত লরা রাজাকে পরিজ্ঞাত করিল। তিনি এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, জয়মতীর নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজ সভায় আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল।

বীর নারী জয়মতী রাজসভায় উপস্থিত হইলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার তেজস্বিতাব্যঞ্জক দীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সতীত্বের জ্বলন্ত প্রভা পাষাণ হৃদয় লরা রাজাকে বিগলিত করিতে অসমর্থ হইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে জয়মতীকে তাঁহার স্বামীর অবস্থানের বিষয় প্রশ্ন করিলেন। সত্য-বাদিনী তেজস্বিনী জয়মতী তাদৃশ সঙ্কট কালেও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব না। রাজপুরুষগণ কখনও প্রলোভন, কখনও বা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী সতী সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আপন সংকল্পে অটল রহিলেন। প্রলোভন এবং ভয় প্রদর্শন বিফল হওয়াতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। পাপিষ্ঠ রাজানুচরবর্গ তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া কাষ্ঠ দণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। এইভাবে পক্ষাধিক কাল অতিবাহিত হইল; আদর্শ সতী প্রাণাধিক স্বামীর প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত যন্ত্রণা অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন। পত্নীর প্রতি এই ভীষণ

অত্যাচারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া গদাপাণি অজ্ঞাতবাসে অস্থির হইয়া পড়িলেন; তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া পত্নীর উদ্ধার সাধন মানসে তাঁহার নিকট ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেন। পতিপ্রাণা সতী ছদ্মবেশ সত্বেও পতিকে দর্শন মাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে অচিরে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মরণাহতা পত্নীর এই শেষ প্রার্থনা উপেক্ষা করিলে মৃত্যুকালে তাঁহার মনের শান্তি অন্তর্হিত হইবে বুঝিতে পারিয়া গদাপাণি আত্মপ্রকাশের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। তারপর তিনি অতৃপ্তলোচনে পত্নীর কাতর মুখমণ্ডল শেষবারের জন্য দেখিয়া লইয়া উন্মাদের ন্যায় তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন পতিপ্রাণা জয়মতী উদ্বেগশূন্য চিত্তে স্বামীর হিতার্থ জীবনের পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। রাজানুচরদের ষোড়শ দিবস ব্যাপী অমানুষিক উৎপীড়নে তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল; পৃথিবীতে পতিপ্রেম ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময় লরা রাজা এবং তদীয় অমাত্যবর্গের পাপের মাত্রা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাদের অত্যাচার উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদিগকে বিদূরিত করিয়া গদাপাণিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তদীয় পুত্র রুদ্র সিংহ জননীর পুণ্য অবদান স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার জীবন নাশ স্থলে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহার তীরে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এই দীর্ঘিকা এবং দেবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া পাতিব্রত্য এবং মাতৃভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সর্ব্বসাধারণের নিকট দীর্ঘিকা জয়সাগর এবং দেবমন্দির জয়দোল নামে পরিচিত।

হংসেশ্বরী ও অনন্তবাসুদেব।

দ্বাদশনারী

রাজপুত রমণী নারীকুলের অলঙ্কার স্বরূপ। রাজপুত রমণী একাধারে কুসুমের মত সুকোমল, বজ্রের ন্যায় কঠিন। অসংখ্য রাজপুত বীরনারী ভারত কণ্ঠে কমনীয় রত্নমালার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আমার এই প্রবন্ধে কতিপয় বীরনারীর জীবনের পবিত্র কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সিন্ধুরাণী

৭১১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ সিন্ধু বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিন্ধুর অধিপতি রাজা দাহির আততায়ী মোসলমানের গতিরোধ জন্য জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে প্রেরণ করিলেন। আরব সেনাপতি মোহাম্মদ কাসিম শৌর্য্য বীর্য্যের অবতার স্বরূপ ছিলেন। তিনি সিন্ধু রাজকুমারের সমস্ত পরাক্রম অতিক্রম করিয়া রাজধানী আলোরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ দাহির এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে আরববাহিনীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রবল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। একটী গোলার আঘাতে রাজহস্তী আহত হইল; হস্তী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া রাজাকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করিল। রাজার তিরোধানে তদীয় সেনাবৃন্দ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। রাজা দাহির নিজে আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার প্রবলোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়শ্রী কিছুতেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। তিনি অসি হস্তে শত্রু নাশ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর মোহাম্মদ কাসিমের সম্মুখে প্রবলতর বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধবা সিন্ধুরাজমহিষী প্রচণ্ড তেজে কাসিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বিজিত সিন্ধু সেনাগণ পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইলেন; তিনি শত্রুর হস্ত হইতে রাজধানী রক্ষার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। বীর রমণীর অপূর্ব্ব বীরত্বে শত্রুর গতি প্রতিহত হইয়া পড়িল। মোহাম্মদ কাসিম অনন্যোপায় হইয়া নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। সিন্ধুর রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছিলেন। অচিরে নগর মধ্যে অন্নাভাব দেখা দিল। এই কারণ দুর্গবাসীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইল। সিন্ধুরাণী আততায়ী মোসলমানের হস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা সমস্ত রমণী এবং বালক বালিকা সহ অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃকল্প করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত সেনাবৃন্দও স্বজাতিসুলভ অনুষ্ঠানে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। রমণী ও বালক বালিকাগণ স্বহস্তে চিতা সজ্জিত করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন। অতঃপর রাজপুত বীরগণ পবিত্র সলিলে অবগাহন ও অন্যান্য ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন পুরঃসর পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন নগরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; রাজপুত বীরগণ অমিত পরাক্রমে শত্রু সৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন একে একে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। সিন্ধুরাজমহিষী ও তাঁহার অনুবর্ত্তী রাজপুত বীরগণের অলোকসামান্য বীরকীর্ত্তি চিরকালের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।

পদ্মিনী

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে লক্ষ্মণ সিংহ চিতোরের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভীমসিংহের পত্নীর নাম পদ্মিনী। পদ্মিনী রূপসী কুলরাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য রূপরাশির খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। দিল্লীর সম্রাট ইন্দ্রিয়বিলাসী আলাউদ্দীন তাঁহাকে হরণ করিবার অভিলাষে চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী রাজপুতগণ স্বদেশের গৌরব রক্ষাকল্পে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। আলা দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পরও জয়শ্রী লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রচার করিলেন যে, তিনি পদ্মিনীকে লাভ করিতে পারিলেই স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন। কিন্তু রাজপুতগণ এই ঘৃণ্য প্রস্তাব যথোচিত অবজ্ঞা সহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন আলা প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি সেই লোক বিমোহিনী রমণীর প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখিতে পাইলেই স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন।

অসংখ্য রাজপুতের রক্তপাত দর্শনে পদ্মিনীর নারীহৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য স্বামী এবং লক্ষ্মণ সিংহকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা আলার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আলা অতিথিভাবে চিতোরে প্রবেশ করিয়া দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি শিষ্ট ব্যবহারে ভীম সিংহকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভীমসিংহ ভদ্রতার রীতি অনুসারে তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিতেছিলেন। তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে বিশ্বাস-

ঘাতক আল্লার পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য আসিয়া অসতর্ক ভীম সিংহকে বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া গেল। আলা ভীম সিংহকে হস্তগত করিয়া প্রচার করিলেন যে, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন।

বীরপতির তাদৃশ আকস্মিক বিপদে পতিপ্রাণা পদ্মিনী অসহ্যদুঃখে পতিত হইলেন; কিন্তু সে তেজস্বিনী রমণীর প্রাণে স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য দুর্জ্জয় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল; তিনি ধীরচিত্তে স্বামীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর একজন দূত মোসলমানের শিবিরে উপনীত হইয়া বলিল, আপনি চিতোর নগরীর অবরোধ পরিত্যাগ করিলেই পদ্মিনী আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। তাঁহার বাল্যসহচরী রাজপুত মহিলাগণ চির বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে এই শিবির পর্য্যন্ত আগমন করিবেন। যে সকল পরিচারিকা তাঁহার সহগামিনী হইবে, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে আসিবে। ইহারা সকলেই অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনী। অতএব কেহ যেন কৌতুহল পরবশ হইয়া তাহাদের শিবিকার বস্ত্র উত্তোলন না করে। কামান্ধ আলাউদ্দীন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চিতোরের অবরোধ পরিত্যাগ করিলেন।

নিরূপিত দিবসে সাত শত বস্ত্রাবৃত শিবিকা মোসলমান শিবিরে প্রবেশ করিল। পদ্মিনী সহচরী ও পরিচারিকাগণের সহিত আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া আলাউদ্দীন উৎফুল্ল হইলেন এবং চিরবিদায়ের পূর্ব্বে ভীম সিংহকে পদ্মিনীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অর্দ্ধঘণ্টার অবকাশ দিলেন। ভীম সিংহ সেই সুযোগে চিতোর পুরীতে পলায়ন করিলেন। আলা কিয়ৎকাল পরে শিবিকাগুলির নিকট উপনীত হইলেন। এই সকল শিবিকায় রাজপুত রমণীগণের পরিবর্ত্তে রাজপুত বীরগণ লুক্কায়িত ছিলেন। তাঁহারা আলাকে

দেখিবা মাত্র প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু আলা অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিলেন বলিয়া রক্ষা পাইলেন। রাজপুতের এই চাতুরীতে তাঁহার রোষাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মোসলমান সৈন্য পুনর্ব্বার দুর্গাবরোধ করিল। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরগণ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন; এই কাল-সমরে বীরকুলতিলক গোরা ও তদীয় দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল লোকাতীত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। (১) তুমুল যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী আলার কণ্ঠে বিজয়মাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু আলা রাজপুত জাতির অসম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া বিহ্বল হইলেন এবং নিজ পক্ষের বহু সৈন্য বিনষ্ট হওয়াতে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া দিল্লীতে প্রতিগমন করিলেন।

মোসলমান সেনার তিরোভাবে রাজপুতগণ শান্তি লাভ করিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতি পূরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে ক্ষতি পূর্ণ হইতে না হইতেই আলাউদ্দীন বিপুল বাহিনী সহ পুনর্ব্বার চিতোরপুরী আক্রমণ করিলেন। শত্রুর পুনরাগমনে বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতগণ প্রবল তেজে অসি হস্তে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। একদিন নিশীথকালে রাণা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়

---

(১) এই যুদ্ধে বীরবর গোরা প্রাণ পরিত্যাগ করেন, বাদল ক্ষত বিক্ষত শরীরে গৃহে প্রতিগমন করেন। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী তাঁহাকে একাকী ফিরিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তদীয় পতি যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিয়াছেন। তিনি পতির অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকান্বিত হন। কিন্তু আপন শোকবেগ রুদ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয়দেবতা কিরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বাদল একে একে পিতৃব্যের অলৌকিক বীরত্বের বর্ণনা করেন। তিনি পতির বীরত্ব গাথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন; তারপর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ইহ সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হন।

তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছে, "মৈ ভুখা হু"। তিনি শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভীষণমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। দেবী বলিয়া উঠিলেন, "আমি রাজবলি চাহি," দ্বাদশ জন রাজকুমার চিতোর রক্ষাকল্পে আত্মবলি না দিলে আর রক্ষা নাই।" দেবীর বাক্যে স্বদেশপ্রাণ রাজকুমারগণ জন্মভূমির রক্ষাকল্পে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে (১) জ্যেষ্ঠানুক্রমে একাদশ রাজকুমার একে একে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। একমাত্র অজয় সিংহ অবশিষ্ট রহিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে রাজকুল নির্ম্মূল হইবে, বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না বলিয়া রাণা তাঁহাকে যুদ্ধে গমন করিতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইলেন।

একদিকে রাণা লক্ষ্মণ সিংহ স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন; অপরদিকে মোসলমানের হস্তে অপমানের আশঙ্কায় বীররমণী পদ্মিনী এবং অন্যান্য চিতোরবাসিনী জ্বলন্ত পাবকে আত্মাহুতি প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মবলে পাশবশক্তিকে পরাভূত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

অগ্নিশিখা সদৃশী রাজপুত রমণী বৃন্দকে দগ্ধীভূত করিবার জন্য অগ্নিকুণ্ড প্রচণ্ড তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রাণা সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, কিন্তু হৃদয় শোণিত দান করিয়াও চিতোর রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। আলা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিলেন, তারপর রক্তসিক্ত পথে ধূমাচ্ছন্ন চিতোরে প্রবেশ করিয়া চিত্তহারিণী পদ্মিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

---

(১) Whether we have merely the fiction of the poet or whether the same was got up to animate the spirit of resistance, matters but little. It is consistent with the belief of the tribe.

দেবলা দেবী

দেবলা দেবী গুজরাটের রাজকুমারী, দুর্ভাগ্যের আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া দিল্লীর সম্রাট সুলতান আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে নীত হন। এখানে তিনি জ্যেষ্ঠ রাজকুমার খিজির খাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষপাতিনী হন। তাঁহাদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। খিজির খাঁর জননী এই বিবাহের বিরুদ্ধবাদিনী হইলেন এবং বাল্য-প্রণয়ের বীজ পুত্রের হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিবার মানসে তাঁহাদের পরস্পরের দর্শন লাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষীণধারা স্রোতস্বতী গন্তব্য পথে বাধা প্রাপ্ত হইলে কূলপ্লাবনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে! রাজকুমারের প্রত্যেক কার্য্যে এরূপ সুগভীর মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, রাজমহিষীর অন্তঃকরণও অবশেষে তাহাতে দ্রবীভূত হইল। তিনি তাঁহাদের বিবাহের অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই প্রেমিক প্রেমিকা দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজনীতির কুটিল চক্রের আবর্ত্তনে খিজির খাঁ পিতৃহৃদয় হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার রোষাগ্নিতে প্রণয়িযুগলের সমস্ত সুখ শান্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রী মালিক কাফুরের চক্রান্তে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে খিজির খাঁ গোয়ালিয়ারের ভীষণ দুর্গে চিরবন্দী হইলেন। এই ভীষণ কারাগারেও দেবলা দেবী তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। এই দুর্ব্বহ অবস্থায় সাধ্বী প্রণয়িনীর সপ্রেম সেবা শুশ্রূষাই খিজিরের একমাত্র সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন ইহলীলা সংবরণ করিলে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ওমর মন্ত্রী মালিক কাফুরের সহায়তায় পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মালিক কাফুর তাঁহাকে নিষ্কণ্টক

করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ রাজকুমার খিজির খাঁর দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই আলাউদ্দীনের ক্রীত দাস ও শরীররক্ষকগণ মালিক কাফুরকে হত্যা এবং ওমরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সম্রাটের চতুর্থ পুত্র কুতবউদ্দীনকে রাজসিংহাসন প্রদান করিল। ইন্দ্রিয়পরবশ কুতব রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেবলা দেবীর অপূর্ব্বরূপলাবণ্যের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। সাধ্বী রমণীর নির্ম্মল চরিত্র তাঁহার পাপলালসা সংযত করিতে পারে নাই। কুতব আপনার পাপাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দেবলা দেবীকে দিল্লীতে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। খিজির খাঁর বদন মণ্ডল ক্রোধে ও ক্ষোভে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি অবজ্ঞাভরে ভৎ´সনা পূর্ণ উত্তর দিয়া রাজদূতকে বিদায় করিয়া দিলেন। কুতব আপনার পাপ সঙ্কল্পে ব্যর্থকাম হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সাদি নামধেয় জনৈক দুরাত্মাকে গোয়ালিয়ারের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। সাদি তথায় উপনীত হইয়া খিজির খাঁকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। নরঘাতকের তরবারি উত্থিত হইলে পতিপ্রাণা দেবলা দেবী ব্যাকুল হৃদয়ে আপনার সমস্ত শক্তি ঘনীভূত করিয়া খিজির খাঁকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু হায়! প্রেমদীপ্ত সতীতেজ সেই কঠোর হৃদয় নির্ম্মম নরহন্তাকে দ্রবীভূত করিতে পারিল না। তাহার আসি সঞ্চালনে দেবীর হস্ত দ্বয় ছিন্ন ও বদন মণ্ডল ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। তাহার পর খিজির খাঁর ছিন্ন মুণ্ড ভূতল চুম্বন করিয়া রক্তধারায় পৃথিবী কলঙ্কিত করিল।

মীরা বাই

মীরা বাই "অতুলনা ভারত ললনা।" মীরা সুন্দরীকুলরাজ্ঞী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। কিন্তু অপরূপ রূপরাশি তাঁহার অমরত্বের কারণ নহে; মীরার অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ এবং ভগবদ্ভক্তিই তাঁহাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে। মীরা বাই যোধপুরের রাজকুমারী, পিতা মাতার স্নেহ পুত্তলি ছিলেন। মীরা বাই আশৈশব সুখৈশ্বর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুরীর অশেষ ভোগবিলাস একদিনের জন্যও তাঁহার জীবন কলুষিত করিতে পারে নাই। শৈশব কালেই মীরার কোমল প্রাণে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইয়াছিল। বালিকা মীরা নানাবিধ মূর্ত্তি লইয়া ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু কৃষ্ণ মূর্ত্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। মীরা সর্ব্বদা এই মূর্ত্তি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, কখন তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেন, কখন তাহার সমক্ষে সুমধুর গান গাহিতেন, কখনও বা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেন। এই ভাবে প্রেম ভক্তিতে তাঁহার বাল্য জীবন বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মীরা উদয়পুরের রাজকুমার কুম্ভের সহিত পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইলেন। শ্বশুরালয়ে যাত্রার পূর্ব্বে মাতা তাঁহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মীরা, তোমার সঙ্গে কি কি সামগ্রী দিব? এই প্রশ্নোত্তরে তিনি কহিলেন, কৃষ্ণ মূর্ত্তিটি আমার সঙ্গে দেও, অন্য কোন সামগ্রী আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। মীরা বাই কৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। ক্রমশঃ তাহার কৃষ্ণ প্রেম ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মীরা বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিলেন, সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তিনি নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করিতেন, সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রেম ভক্তিতে মত্ত থাকিতেন, তাঁহার নাম জপ করিয়াই চরিতার্থ হইতেন।

মীরা বাইর শ্বশুরকুল শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্য ভোগ বিলাস ভাল বাসিতেন। মীরার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ এবং বিলাস বিমুখতা তাঁহাদের নিকট সাতিশয় অপ্রীতিকর হইল; তাঁহারা তাঁহার সাধন ভজনে বাধা জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রেম ভক্তি নিরুদ্ধ নির্ঝরিণীর মত সমধিক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন মীরার শ্বশুর কুল নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে রাজভবন হইতে দূরীকৃত করিয়া অন্যস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

মীরাবাই নির্জ্জন স্থানে নির্ব্বাসিতা হইয়া সাধন ভজনের অধিকতর সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নির্ব্বাসন দণ্ড তুচ্ছ করিয়া কায়মনোবাক্যে সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। মীরা তথায় সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে সাধু সজ্জন এই ক্ষুদ্র মন্দিরে আগমন করিয়া সাধন ভজন করিতেন। বস্তুতঃ মীরার কৃষ্ণমন্দির পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। একদা রাজকুমার কুম্ভ মীরাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিলেন। তৎকালে মীরা নৃত্যগীত দ্বারা স্বীয় আরাধ্য দেবতার আরতি করিতেছিলেন। রাজকুমার এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং মীরাকে বধ করিবার জন্য তরবারি কোষোন্মুক্ত করিলেন, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল। অতঃপর মীরা দেশ পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপন ইষ্ট দেবতার লীলা নিকেতন বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এইস্থানে তাঁহার হৃদয় প্রেম ভক্তিতে সুগন্ধ কুসুমের মত বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহার সৌরভে চারিদিক্

পরিপূর্ণ হইল ; মীরার পুণ্যকথা শত শত কণ্ঠে বিঘোষিত হইতে লাগিল। মীরার এই বিমল যশোরাশি কুম্ভকে আকৃষ্ট করিল। তিনি মীরার দর্শন মানসে ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন।

অতঃপর পতি পত্নীতে মিলন হইল। তাঁহারা মিলিত হইয়া মনের আনন্দে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। রাণা কুম্ভ কাব্য রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচনা ভাবের প্রাচুর্য্যে ও ভাষার সৌন্দর্য্যে অতি রমণীয় ছিল। মীরারও কবিত্ব শক্তি ছিল। বঙ্গীয় কাব্য-কাননের কোকিল জয়দেব মীরার সমসাময়িক ছিলেন। রাজপুতনার ধর্ম্মপ্রাণ রাজদম্পতি সর্ব্বদা জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী পাঠ করিতেন। রাণা কুম্ভ গীতগোবিন্দের উত্তর ভাগ লইয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মীরাবাইও অসংখ্য কবিতার রচয়িত্রী। তদীয় উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে এই সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সুমধুর পদাবলী পাঠে আজও অনেক ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠে।

মীরাবাই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি কোমলপ্রাণ অবলা হইয়াও ভগবদ্ভক্তির বলে পথের সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম সহ্য করিতেন। বস্তুতঃ ভ্রমণোপলক্ষে তাঁহার চরিত্রে পুরুষোচিত সাহস, উৎসাহ ও কষ্টসহিষ্ণুতা পরিদৃষ্ট হইত। তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইলে মীরার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে ভগবদ্ভক্তি শতমুখে ফুটিয়া বাহির হইত ; তন্মূলক নানা অনুষ্ঠানে চারিদিক উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিত। এই সকল অনুষ্ঠানকালে মীরার অসাধারণ ভাবোন্মত্ততা দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইত।

এই অংশ শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

তারাবাই

রাজপুত বীরগাথা বীর্য্যবান পৃথ্বীরাজ ও বীরবালা তারার কীর্ত্তি কলাপে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রায় সুরতন নামক একজন সত্যসঙ্কল্প রাজপুত বীর বেদনোরের সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রায় সুরতন চিরবিখ্যাত সোলাঙ্কি বংশ সম্ভূত ছিলেন। বেদনোরের সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি মধ্য ভারতের অন্তর্গত তঙ্কটোড়ার অধিপতি ছিলেন। লিল্লা নামক একজন আফগান সেনাপতি তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া তঙ্কটোড়া অধিকার করেন। সুরতন স্বরাজ্যচ্যুত হইয়া মেবারের অন্তর্গত আরাবলীর পাদদেশস্থিত বেদনোরে আসিয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। চিতোরের রাণা রায়মল্ল সুরতনকে বেদনোরের সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই রায় সুরতনের কন্যার নাম তারাবাই। তারা বাল্যকাল হইতেই অশ্বচালনা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। যে সময় তারা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, তখন রায় সুরতন টোড়ার উদ্ধারসাধন জন্য সমরানল প্রজ্জলিত করেন। বীরবালা তারাবাই যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাজপুত সৈন্য বিপুল পরাক্রমে যুদ্ধ করিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এই প্রত্যাবর্ত্তন কালে অশ্বারোহিণী সৌন্দর্য্যলীলাময়ী তারাবাই চিতোরের তৃতীয় রাজকুমার জয়মল্লের দৃষ্টিপথে পতিত হন। সে অতুল রূপরাশির প্রথম দর্শনেই জয়মল্ল একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়েন; তিনি তারার পাণিপ্রার্থী হন। রায় সুরতন উত্তর করিলেন,

টোড়ার উদ্ধার সাধন কর, তারা তোমার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবে। জয়মল্ল এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া টোড়ার উদ্ধার সাধন জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারার তরঙ্গিত রূপরাশি তাঁহাকে একেবারে বিমোহিত করিয়াছিল, এজন্য তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াও তারাকে অঙ্কলক্ষী করিবার জন্য বল প্রকাশে উদ্যত হইলেন। রায় সুরতন এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়মল্লকে হত্যা করিলেন। জয়মল্লের হত্যা সংবাদ ক্রমে রাণা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইল। তিনি ধীরভাবে অদ্যোপান্ত শ্রাবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকুমার সোলাঙ্কি বংশের চিরোজ্জ্বল নামে কলঙ্ক লেপন করিতে উদ্যত হইয়া আপনার দুষ্কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি লোকাতীত মহাপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়া অপরাধী পুত্রের হত্যাকারী সুরতনকে তাঁহার তেজস্বিতা ও সৎসাহসের জন্য পুরস্কৃত করিলেন।

চিতোরের চতুর্থ রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রায় সুরতন ও তদীয় বীর-বালার অসাধারণ তেজস্বিতা দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। তিনি সে রমণীরত্নের অভিলাষী হইয়া শত্রুহস্ত হইতে টোড়ার উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। পৃথ্বীরাজ শৌর্য্য বীর্য্যের আধার ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের বিষয় তারাবাই সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কারণ তিনি তাঁহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক টোড়ার উদ্ধার সাধনকল্পে পৃথ্বীরাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা পাঁচশত রাজপুত সৈন্য সহকারে টোড়ার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ শত্রুপুরীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহরমের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, নগরবাসীরা উৎসবে মত্ত হইয়া অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। কৌশলী বীর, সেনাদল দুর্গের

বাহিরে রাখিয়া মাত্র বীরবালা তারাবাই ও আপনার চিরসহচর সেনগড়ের সামন্তকে সঙ্গে লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন; তারপর রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উৎসবরত জনসঙ্ঘের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। এই সময় আফগান অধিপতি উৎসবে যোগ দিবার জন্য প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি জনসঙ্ঘের মধ্যে তিন জন অপরিচিত লোক দেখিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ তদীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের বর্ষা ও তারাবাইর ধনুর্ব্বাণ তাঁহার ইহলীলার শেষ করিয়া দিল। এই আকস্মিক বিপদপাতে আফগানেরা কিয়ৎকালের জন্য একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজ এবং তদীয় সহচর ও সহচরী সেই অবসরে দুর্গের বহির্দ্বারের নিকট আগমন করিলেন। এই সময় এক বিপুলকায় হস্তী তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তারাবাই অসম সাহসে তরবারির আঘাতে হস্তীর শুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহারা নিরাপদে স্বসৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পর মুহূর্ত্তেই আফগানেরা তাঁহাদিগকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিল। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর বীরবালা তারাবাই বিজয়ী পৃথ্বীরাজের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়া বীরজায়া হইলেন। নবীন দম্পতি সুনির্ম্মল আনন্দ নীরে ভাসমান হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সুখের দিন অচিরেই অতীত হইল। শত্রুর বিষ প্রয়োগে পৃথ্বীরাজ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পতিগতপ্রাণা তারাবাই প্রাণপতিসহ জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। চিতা সজ্জিত হইল, অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পূতচিতা আবরিত করিল,

"ভস্মসাৎ নরদেহ—চিতা নির্ব্বাপণ,
ধূলায় মিশিল ধূলা জীবনে জীবন।"

ধাত্রী পান্না

পাদশাহ হুমায়ূনের অনুগ্রহে (১) পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকারী হইয়া দুষ্টবুদ্ধি রাণা বিক্রমজিৎ ক্রমশঃ অত্যাচার এবং উৎপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া মিবারের উজ্জ্বল রাজপদ কলঙ্কিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারগণ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপ্রাপ্তবয়স্ক উদয়সিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন; উদয়সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় খুল্লতাতের দাসীপুত্র বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার অর্পিত হইল।

শাসন ক্ষমতার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বনবীর ক্ষমতালোলুপ হইলেন, রাজসিংহাসনের ঐশ্বর্য্য তাঁহার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিল। বনবীর শিশু উদয়সিংহকে হত্যা করিয়া আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদা গভীর রাত্রিতে একজন বিশ্বস্ত অনুচর আসিয়া উদয়সিংহের মাতৃ সদৃশী ধাত্রী পান্নাকে সংবাদ দিল, দুর্ব্বৃত্ত বনবীর নিষ্পাপ শিশু উদয়সিংহকে হত্যা করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নারী হৃদয়ে অপূর্ব্ব মহাপ্রাণতা উত্থিত হইল। তিনি বাপ্পারাওর পবিত্র কুল রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ধাত্রী নিঃশব্দে ফলের ঝুরিতে সুপ্তিমগ্ন উদয়সিংহকে রাখিয়া তাহা পাতা দ্বারা আবৃত করিলেন এবং তারপর সে ঝুরি

---

(১) গুজরাটের পাঠান অধিপতি বাহাদুর শাহ রাণা বিক্রমজিৎকে পরাজিত করিয়া মিবার অধিকার করেন। রাজমাতা কর্ণবতী মিবারের উদ্ধার সাধন জন্য দিল্লীর পাদশাহ হুমায়ুনের নিকট রাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন এই রাখী গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ করেন; তাঁহার বাহুবলে বিক্রমজিৎ পুনর্ব্বার স্বরাজ্যাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন।

ঐ বিশ্বস্ত অনুচরের যোগে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বনবীর অসি হস্তে আগমন পূর্ব্বক পান্নাকে উদয়সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্না নীরবে অধোবদনে স্বীয় নিদ্রিত শিশুপুত্র চন্দনকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন। বনবীর উদয়সিংহ বোধে হস্তের অসির আঘাতে চন্দনের হত্যাসাধন করিয়া চলিয়া গেল। "নিশ্চল দেবীপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া পান্না সব দেখিলেন ;" পৃথিবীতে অসামান্য স্বার্থত্যাগ ও অলৌকিক তেজস্বিতার অক্ষয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।

দুর্গাবতী

রাণী দুর্গাবতী আকবর শাহের সমসাময়িক। এই প্রাতঃস্মরণীয়া বীর নারী বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন রাজধানী মাহোবার অধিপতির কন্যা। দুর্গাবতী অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। নারীজনোচিত কমনীয় গুণরাজি তাঁহার ভূষণ স্বরূপ ছিল। গড়মণ্ডলের ভূপতি দলপতশাহ এই রমণীরত্নের পাণিপ্রার্থী হন। গড়মণ্ডল রাজ্য পবিত্রসলিলা নর্ম্মদার তীরে প্রতিষ্ঠিত এবং সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু উহার রাজবংশের তাদৃশ সামাজিক মর্য্যাদা ছিল না। মাহোবার অধিপতি অতি সম্ভ্রান্ত রাজপুতবংশসম্ভূত ছিলেন, একারণ সাতিশয় গৌরব অনুভব করিতেন। তিনি বংশগৌরব নাশ ভয়ে দলপত শাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর তিনি বলিয়া পাঠান, যদি দলপতশাহ বাহুবলে দুর্গাবতীকে আমার ভবন হইতে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিপীড়ন করিতে পারেন, তবে আমি প্রীতি লাভ করিব। দলপতশাহ তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৈন্য

বলও যথেষ্ট ছিল। তিনি ঐ প্রস্তাব শ্রুত হইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহ মনোমোহিনী দুর্গাবতীকে লাভ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। প্রবল যুদ্ধে দুর্গাবতীরত্ন লাভ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। তেজস্বিতার সহিত তেজস্বিতা মিলিত হইল, সুখের সীমা রহিল না। মধ্যভারতে অদ্যাপি রাণী দুর্গাবতীর নাম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গড়মণ্ডল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের রাজন্যকূলে আর কেহই রাণী দুর্গাবতীর তুল্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতে পারেন নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড়মণ্ডল রাজ্য দৈর্ঘ্যে তিন শত মাইল, পার্শ্বে একশত মাইল ছিল। সমগ্র রাজ্য ধনধান্য পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, গড়মণ্ডল রাজ্যে ৭০ হাজার জনপূর্ণ পল্লী ও নগর ছিল।

গড়মণ্ডল রাজ্যের ঐশ্বর্য্যকাহিনী আকবর শাহের অন্যতম ওমরাহ আসফ খাঁকে আকৃষ্ট করে, তিনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বিপুল মোগল বাহিনী লইয়া গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই সময় দলপত শাহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন এবং তদীয় বিধবা মহিষী দুর্গাবতী অপরিণতবয়স্ক পুত্রের প্রতিনিধিরূপে শাসন কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তেজস্বিনী দুর্গাবতী শত্রুর আগমন সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া তাহার গতি রোধ জন্য বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। আট হাজার অশ্বারোহী এবং ততোধিক পদাতিক সৈন্য, দেড় হাজার রণ হস্তী সহ তাঁহার সাহায্যার্থ সজ্জিত হইল। বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার যোদ্ধৃবেশ, মস্তকে শিরস্ত্রাণ, হস্তে শাণিত বর্ষা ও পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ দেখিয়া লোকে ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িল; সৈন্য মধ্যে মহোৎসাহের সঞ্চার হইল। স্বদেশানুরাগের সহিত বীর নারীর

উদ্দীপনা মিলিত হইয়া সৈন্যবৃন্দকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া তুলিল। মোগল সৈন্য ক্রমান্বয়ে দুইবার দুর্গাবতীর হস্তে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল ; ছয় শত প্রাণশূন্য মোগল সৈন্য রণক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া মোগল বাহিনীর দুর্দ্দশার পরিচয় দিতে লাগিল। বিজয়শ্রীশালিনী রাণী দুর্গাবতী শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তদীয় মন্ত্রিগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ক্লান্ত সৈন্যের বিশ্রামের জন্য অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রি ও সৈন্যগণের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া রাণী অগত্যা এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। এক দিকে রাণী দুর্গাবতী সসৈন্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ; অপর দিকে মোগল সেনাপতি ঘোর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ ও নষ্ট গৌরবের উদ্ধার সাধন জন্য নবাগত সৈন্যসহ নবতেজে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাণী দুর্গাবতী শত্রুর পুনরাগমন সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া তাহাদের গতিরোধ জন্য একটি সঙ্কীর্ণ গিরি সঙ্কটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আসফখাঁ কামান লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে হিন্দু সৈন্যের সমস্ত পরাক্রম ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। রাজকুমার বীর নারায়ণ শত্রুহস্ত নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতে আহত হইলেন। তেজস্বিনী রাণী প্রাণাধিক পুত্রের তাদৃশ বিপদাপন্ন অবস্থা দেখিয়াও অবিচলিত রহিলেন ; আহত পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিয়া অমিত পরাক্রমে শত্রু সৈন্য মন্থন করিতে লাগিলেন। তদীয় সৈন্যগণ রাজকুমারকে আহত দেখিয়া নিরুৎসাহ হইল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাণী দুর্গাবতী এই ভাগ্য বিপর্য্যয়েও অবিচলিত রহিলেন, কেবল মাত্র তিনশত সৈন্য লইয়া প্রবলোৎসাহে অসমসাহস সহকারে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ; কিছুতেই একপদও

পশ্চাৎপদ হইলেন না। শত্রুহস্ত নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল, তিনি স্বহস্তে ঐ শর উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার একাংশ চক্ষুর অভ্যন্তরে ভাঙ্গিয়া রহিল। ইহার পর আর একটী শর আসিয়া তাহার গ্রীবা দেশে বিদ্ধ হইল। এই উভয় স্থানের যন্ত্রণায় তাঁহার নিকট চারি দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। জয়াশা তিরোহিত হইল। একজন বিশ্বস্ত পরিচারক তাঁহাকে রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি অবজ্ঞাভরে এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া কি আত্মসম্মানও বিসর্জ্জন করিতে হইবে? আমরা এতদিন যশঃ ও মর্য্যাদা লাভ জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছি; এখন কি ঘৃণ্য জীবনের জন্য সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত যশঃ ও মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিব? যদি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার বর্ষার আঘাতে আমার জীবনান্ত কর, তাহা হইলে আমাকে আর আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। রাণীর বাক্যে পরিচারক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এদিকে শত্রুকুল তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী শত্রু হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কায় সহসা পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারকের কোষ হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া স্বীয় হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার প্রাণ শূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল।

এই সময় ছয় জন মহাবীর রাণীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন; তাঁহারা এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে স্বদেশের জন্য জীবনবিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একে একে ছয় জনেই শত্রু নাশ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

কর্ণেল শ্লিম্যান লিখিয়াছেন যে, দুই গিরির মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে রাণী দুর্গাবতীর প্রাণ বিসর্জ্জনের স্থান অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। পথিকগণ এই নির্জ্জন স্থান অতিবাহিত করিবার সময় তথায় স্বর্গীয়া দুর্গাবতীর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে স্ফটিক অর্পণ করিয়া থাকে। এই স্থানের চতুঃপার্শ্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্ফটিক পাওয়া যায়। কর্ণেল শ্লিম্যানও তাহার একটী অর্পণ করিয়া রাণী দুর্গাবতীর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ মহিষী

আকবর শাহের বিশাল রাজপুরীতে খুস্‌রোজের বাজার বসিয়াছে; এই বাজারে—

কত বা সুন্দরী রাজার দুলালী
ওমরাহ জায়া আমীর জাদী
নয়নেতে জ্বালা অধরেতে হাসি
অঙ্গেতে ভূষণ মধুর নাদী—

ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন, এবং আপনাদের কমনীয় কান্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন। স্বয়ং আকবর শাহ ছদ্মবেশে সে রূপের হাটে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং স্বীয় অসংযত হৃদয়ের সুখাবেশে উচ্ছলিত হইতেছেন। এই সখের বাজারে স্বামীর অনুরোধে অপূর্ব্ব সুন্দরী পৃথ্বীরাজমহিষী (এই মহিলা মিবার সম্ভূতা এবং সম্পর্কে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন) আগমন করিয়াছেন। কিন্তু প্রমোদমত্ত রূপসিকুলের শীলতাহীন ভাবভঙ্গীতে তাঁহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; তিনি অচিরে বিলাসের সে লীল

নিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিদ্যুৎপ্রভাতুল্য রূপ আকবরকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মোহাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। অগ্নিশিখা সদৃশী বীরাঙ্গনা এই আত্মঅবমাননায় ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং স্থানাস্থান পাত্রাপাত্র সমস্ত ভুলিয়া আকবর শাহের রূপ লালসা চিরকালের জন্য শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উত্তোলন করিলেন। সম্রাট কুসুম স্তবকের অভ্যন্তরে তাদৃশ হলাহল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বীয় বক্রভাব দমন করিয়া ভদ্রতাসহকারে সে রমণী রত্নকে বিদায় দিলেন। "তেজস্বিনী রাজপুত সতী আপন মহত্ত্ব গরিমার উজ্জ্বলতর বেশে স্বামী সকাশে গমন করিলেন।" (১)

যোধপুর মহিষী

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পাদশাহ শাহজাহান সহসা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হন। এই সময় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারা রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ রাজকুমারগণ মধ্যে সুজা বঙ্গদেশে, আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে এবং মুরাদ গুজরাটের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাসী রাজকুমারগণ পিতার পীড়ার সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া রাজ্যলালসায় ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হন। দারা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের গতিরোধ করিবার জন্য যোধ-পুরের মহারাজ যশোবন্তের সৈনাপত্যে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। চাম্বল নদীর তীরে শামগড় নামক স্থানে উভয়

---

(১) আর্য্যনারী।

পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইলে প্রবল যুদ্ধ আরব্ধ হয়। বিজয়লক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের দিকে হেলিয়া পড়েন, যশোবন্ত সিংহ বহু যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। এই সংবাদে তদীয় তেজস্বিনী মহিষী নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত সিংহ যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে মহারাণী তাঁহার তথাকথিত কাপুরুষতায় রাগান্ধ হইয়া দুর্গ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন দূতগণ আসিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছেন, তারপর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া স্বসৈন্যের অযথা রক্তপাত নিবারণোদ্দেশ্যে কেবল মাত্র ৪।৫ শত অনুচর সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই প্রবোধ বাক্যেও তেজস্বিনী মহারাণীর ক্ষুব্ধচিত্ত শান্তভাব ধারণ করিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ যশোবন্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বংশে,—উদয়-পুরের রাজবংশে বিবাহ করিয়াছেন, বীরকুলবরেণ্য রাণার জামাতা কখনও তাদৃশ হীনমতি হইতে পারে না। মহারাজা চিরপূজ্য রাজ বংশের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া সে বংশের অনুকরণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। মহারাজা রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেই আমি প্রীতিলাভ করিতাম।" ইহার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মহারাণী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "তোমরা মিথ্যাবাদী, মহারাজা কখনও শুভ্র যশোরাশিতে কলঙ্ক লেপন করেন নাই। তিনি নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমি সহমরণে যাইব, তোমরা সকলে চিতা সজ্জিত কর।" ইহার পর মুহূর্ত্তেই পুনর্ব্বার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি মহারাজার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ভর্ৎসনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ এক ভাবের পর আর একভাব উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এইভাবে

সপ্তাহাধিক অতীত হইলে তদীয় মাতা আগমন পূর্ব্বক নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে তাহাকে শান্ত করিলেন। মহারাণীর পতিভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল; তিনি মহারাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

এই সময় আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃকুল নির্ম্মূল করিয়া দিল্লীর রাজতক্তে আরোহণ করিলেন। নবাভিষিক্ত সম্রাট মহারাজ যশোবন্তকে সাদরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ যশোবন্ত রাজকার্য্যানুরোধে কাবুলে গমন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় রাজার লোকান্তর হইল। তৎকালে মহারাজার মহিষীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মহারাজার পরলোক গমনের পর তিনি পুত্রদ্বয়সহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মতিচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব দিল্লীতে তাঁহাদের শিবির অবরুদ্ধ করিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিলে তিনি যে কৌশলে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাহা তাঁহার প্রখর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। রাণীর কতিপয় অনুচর কার্য্যব্যপদেশে স্বদেশে গমন জন্য পাদশাহের অনুমতি লাভ করে। তাহাদের যাত্রার প্রাক্কালে রাজপুত্রদ্বয়ের সমবয়স্ক দুইজন বালক রাজভূষণে ভূষিত হইল এবং একজন সঙ্গিনী রমণী রাণীর বেশ পরিধান করিল। ভণ্ড বেশ ধারণের পর ইহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া রাণী প্রহরিগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাজপুত্রদ্বয় ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের পলায়ন বার্ত্তা প্রচারিত হইলে পাঁচ সহস্র মোগল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাস বিপুল পরাক্রমে মোগল সৈন্যকে একটি গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ করিলেন; ইত্যাবকাশে মহারাজ যশোবন্তের মহিষী নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন।

রূপনগরী

রূপনগরী অর্থাৎ রূপনগরের রাজকুমারী অসামান্য রূপবতী ছিলেন ; এই সৌন্দর্য্যলীলাময়ী রমণীর খ্যাতি দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিল। দিল্লীর পাদশাহ আওরঙ্গজেব সংযতেন্দ্রিয় বলিয়া প্রশংসিত ছিলেন, কিন্তু মনোমোহিনী সুন্দরী রূপনগরীর সৌন্দর্য্য খ্যাতি তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত করিল ; তিনি রূপনগরীর পাণিপ্রার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ক্ষুদ্র রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবি রাজা এই সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় কন্যাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পাদশাহ রূপনগরের অধিপতির সম্মতি লাভ করিয়া রাজকুমারীকে রাজধানীতে আনয়ন জন্য দুই সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু গর্ব্বিতা রাজকন্যা কুলমর্য্যাদা নাশভয়ে আকুল হইয়া আওরঙ্গজেবের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া মোগল সৈন্য সহ গমন করিতে অসম্মত হইলেন। কন্যার তাদৃশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রূপনগরের অধিপতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আওরঙ্গজেবের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে তাঁহাকে রাজসৈন্যের সঙ্গে পাঠাইতে উদ্যোগী হইলেন। এই কারণ রূপনগরী অনন্যগতি হইয়া রাজকুলতিলক রাজসিংহের শরণাগত হইলেন এবং স্বীয় উদ্ধার কর্ত্তার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।

মহারাণা রাজসিংহ যুদ্ধে স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া যশঃ এবং বিপন্ন রাজ-বালাকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি একদল সৈন্য সহ দ্রুতগতিতে আরাবলী পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক রূপনগরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং পথ পার্শ্বে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইস্থানে তিনি মোগল সৈন্যকে

পরাজিত করিয়া তেজস্বিনী বীরবালার উদ্ধার সাধন করিলেন; রূপনগরীর মুখশ্রী লজ্জা ও প্রীতির অপূর্ব্ব উন্মেষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল; তিনি বিজয়ী বীরের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

গুণোর রাণী

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ভূপাল রাজ্যের একাংশে গুণোর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দোস্ত মোহাম্মদ নামা আওরঙ্গজেবের জনৈক বিচক্ষণ সেনাপতি ঐ গুণোর রাজ্যের পার্শ্বে ভূপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর দোস্ত মোহাম্মদ গুণোর রাজ্যের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাও স্বাধিকারভুক্ত করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। দোস্ত মোহাম্মদ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য গুণোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গুণোর নগর অধিকার করিলেন। তৎকালে গুণোররাণীর অনিন্দ্য রূপমাধুরীর খ্যাতি সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। ইন্দ্রিয়বিলাসী দোস্ত মোহাম্মদ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া আপনার পাপলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য গুণোর রাণীকে রমণীর পরম ধন সতীত্বরত্ন জলাঞ্জলি দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। রাণী দোস্তের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সাজসজ্জার জন্য দুই ঘণ্টা সময় চাহিলেন। রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাণী বিজয়ীবীরের সজ্জার জন্য একটি মনোহর পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তার নানাবিধ বিচিত্র আভরণ প্রেরণ করিলেন। দোস্ত মোহাম্মদ এইসকল রমণীয় বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে যথাসময়ে ছাদের উপর রাণীর সন্নিধানে গমন করিলেন। রাণীর "অতুল রূপরাশি নবাবের সম্মুখে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল।" তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইল যে, জনশ্রুতি সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় অক্ষম হইয়াছে। তখন তিনি বিগলিত হৃদয়ে রাণীর সহিত মধুর বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষণ পরেই তাঁহার দেহে অসহ্য জ্বালা আরম্ভ হইল। তৎক্ষণাৎ পাখা ও পানীয় জল আনীত হইল। কিন্তু দেহের জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; নবাব বরসজ্জা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। নবাবকে তদবস্থায় দেখিয়া রাণী বলিতে লাগিলেন, "খাঁ, জানিও, তোমার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে। আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু এক সময়েই সাধিত হইবে। তোমার পরিহিত এই পরিচ্ছদ বিষাক্ত; আমার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া আমি এই কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।" এই তেজোগর্ভ বাক্যে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই ভয় এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে রাণী উলম্ফন প্রদান পূর্ব্বক প্রাসাদের পার্শ্ববাহিনী নর্ম্মদা গর্ভে পতিত হইয়া ইহ জীবনের শেষ করিলেন। অতঃপর দোস্ত মোহাম্মদ যন্ত্রণায় ছট ফট করিতে করিতে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

কৃষ্ণাকুমারী

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৃষ্ণাকুমারী ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কৃষ্ণাকুমারী উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা। কৃষ্ণাকুমারী অনুপম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রূপমাধুরী খেলিয়া বেড়াইত। তাঁহার আচার ব্যবহারে এরূপ একটী অপূর্ব্ব মহিমাময়ী ভঙ্গী দেখা যাইত, যাহা ছোট বড় সকলকেই মুগ্ধ করিত। বস্তুতঃ কৃষ্ণাকুমারী যথার্থই রাজপুতকুসুম সদৃশ ছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ম্যালকলম সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "কৃষ্ণাকুমারী

অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ যৌবন সিংহকে দেখিয়াছি; এই রাজকুমারের সহিত রাজকুমারী কৃষ্ণার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল। যৌবন সিংহের বর্ণ সুগৌর, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুন্দর ও সুগঠিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটী কোমল শ্রী দীপ্ত রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সুন্দর বদন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও তেজস্বিতার পরিচায়ক।"

যোধপুরাধিপতি রাজপুতললনাকুসুমের পাণিপ্রার্থী হইলেন; রাজা ভীমসিংহও আহ্লাদ সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই যোধপুরাধিপতি অকালে পরলোক গমন করিলেন।

অতঃপর রাণা ভীমসিংহ জয়পুরের মহারাজ জগৎ রায়ের সহিত স্বীয় দুহিতা রত্নের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এদিকে যোধপুরাধিপতির উত্তরাধিকারী মহারাজ মানসিংহও কৃষ্ণাকুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলেন। ফলতঃ কৃষ্ণাকুমারীরূপ অপরূপ রত্ন লাভের জন্য দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ইঁহারা উদয়পুরের রাণা অপেক্ষা বলশালী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণাকুমারীর হস্ত লাভ করিতে অসমর্থ হইলে সমরানল প্রজ্বলিত কবিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। মহারাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। কাহাকে উপেক্ষা করিয়া কাহার হস্তে কৃষ্ণাকুমারীকে অর্পণ করিবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন। ইহাতে মহারাজ জগত রায় এবং মহারাজ মানসিংহ উভয়েই অসন্তুষ্ট হইয়া উদয়পুর রাজ্যের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই সকল সৈন্য রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেশ ছারখার করিতে লাগিল।

বলহীন মহারাণা এই দৌরাত্ম্যের প্রতিরোধ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে

রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার রাজগৌরব পরিম্লান হইয়া পড়িল। তাঁহার অপত্যস্নেহ ক্ষুণ্ণ হইল। তিনি এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। তাদৃশ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার একমাত্র ভয়াবহ উপায় দেখা দিল;—সে উপায় সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ কৃষ্ণাকুমারীর অপসারণ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যোধপুর ও জয়পুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজ্য মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা। শোণিতলোলুপ মন্ত্রী আমীর খাঁ মহারাণাকে এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য কুমন্ত্রণা দিলেন। এই লোমহর্ষ প্রস্তাবে মহারাণা শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার স্নেহশীল হৃদয় ব্যথিত হইল। পরিশেষে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণাধিক দুহিতার প্রাণ হরণে স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু কুসুমকোমলা কৃষ্ণাকুমারীর পবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিবার উপযুক্ত নির্ম্মম লোক পাওয়া দুর্ঘট হইল। মহারাণা স্বীয় আত্মীয় মহারাজ দৌলত সিংহকে এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এই লোমহর্ষ প্রস্তাব শুনিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, যে জিহ্বা হইতে এরূপ প্রস্তাব বাহির হয়, সে জিহ্বাকে ধিক! আর যদি বন্ধুতা রক্ষার জন্য এইরূপ কাজে লিপ্ত হইতে হয়, তবে সে বন্ধুতায় ধূলি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। অতঃপর মহারাণা আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ধরিয়া বসিলেন এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীকৃত হইলেন। কৃষ্ণার প্রাণনাশ জন্য তরবারি হস্তে তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই সময় সে নিষ্পাপমতি অবলা নিদ্রিতা ছিলেন; তদীয় পিতৃব্য কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, "শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল কুসুমরাশি ঢালিয়া দিয়াছে;" সে প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যে

সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। এ দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত মথিত হইয়া উঠিল, তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল।

অতঃপর মহারাণার দুরভিসন্ধির বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাজমহিষী এই আসন্নবিপদে শোকে দুঃখে ক্ষিপ্ত হইলেন, তাঁহার করুণ বিলাপে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কৃষ্ণাকুমারী নিজে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিচলিত রহিলেন। তিনি পিতা, পরিবার ও জাতির উদ্ধার কল্পে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এবার তরবারির পরিবর্ত্তে বিষ প্রয়োগে তাঁহার জীবন নাশ করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল। কৃষ্ণাকুমারী পিতার মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তারপর অম্লান বদনে পিতার প্রেরিত বিষপাত্র মুখে তুলিয়া ধরিলেন। রাজ মহিষীর বিলাপধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি নানাছন্দে মহারাণার উদ্দেশ্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণাকুমারীর চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুও পতিত হইল না। তিনি ধীর বচনে মাতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন; বলিলেন, জীবনের সকল কষ্টের অবসান হইতেছে, মা, ইহাতে কি জন্য শোকে কাতর হইতেছ? আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি কি তোমার সন্তান নই? আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমরা জন্মাবধি বলির জন্য চিহ্নিত হইয়া থাকি। আমরা ইহলোকে আসিতে না আসিতেই পুনর্ব্বার পরলোকে প্রেরিত হই। আমি যে এতদিন জীবিত রহিয়াছি, তজ্জন্য পিতাকে ধন্যবাদ। এইভাবে মাতাকে প্রবোধ দিয়া কৃষ্ণা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে বহু বিলম্ব হইল; এজন্য কৃষ্ণাকুমারী আর দুই পাত্র বিষ নিঃশেষ করিয়া পান করিলেন। অতঃপর বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। রাজপুত কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িল।

কর্ম্মদেবী

প্রথমা

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দৃশদ্বতীর তীরবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে ঘোর সেনাপতি সাহবুদ্দীনের হস্তে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি এবং অনুরক্ত সুহৃদ চিতোরের রাণা সমর-সিংহ রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লীর দুর্গপ্রাকারে মোসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল। পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া সমরসিংহের প্রিয়তমা মহিষী পৃথ্বা জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পতির অনুগমন করিলেন! দিল্লীনগরী অধিকার, সমরসিংহের দেহপাত, শ্রেষ্ঠ রাজপুতগণের মৃত্যু,—এই সকল ঘটনার পর মোসলমানের রাজ্যাধিকার সহজসাধ্য হইল। রাজ্যের পর রাজ্য অধিকৃত হইতে লাগিল। সাহবুদ্দীনের সহকারী কুতবুদ্দীন সসৈন্যে চিতোরের দ্বারদেশে আগমন করিলেন। কিন্তু এই স্থানে বিজয়দৃপ্ত মোসলমানের অপ্রতিহত গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই সময় সমরসিংহের অপরিণতবয়স্ক পুত্র কর্ণ চিতোরের সিংহাসনা-ধিকারী ছিলেন। তদীয় মাতা বীর্য্যবতী কর্ম্মদেবী শত্রুর বিনাশ সাধন জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি নিজে সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া বিপুল রাজপুতবাহিনী সহ শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অম্বরের নিকট উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিজয়শ্রী কর্ম্মদেবীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কুতবুদ্দীন আহত ও পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধকালে নয় জন করদ রাজা ও এগার জন সামন্তরাণী কর্ম্মদেবীর সঙ্গে ছিলেন।

দ্বিতীয়া

মোগল কুলতিলক পাদশাহ আকবর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মিবার ভূমির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং বিপুলবাহিনী সমভিব্যাহারে চিতোরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। এই সময় ভীরুস্বভাব উদয়সিংহ চিতোরের সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। প্রবল শক্রর আগমনে উদয়সিংহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থা দর্শন করিয়া তদীয় অন্যতমা রাণী (এই রাণীর সঙ্গে উদয়সিংহের শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে;) অসীম তেজে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং রাজপুত সৈন্যের পরিচালনভার গ্রহণপূর্ব্বক মোগলশিবিরে আকস্মিক বিপদের ন্যায় পতিত হইলেন। মোগলসৈন্য তাদৃশ প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পাদশাহ আকবর ভগ্নচিত্তে রাজধানীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

উদয়সিংহ শক্রর আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সর্ব্বত্র রাণীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে মিবারের কতিপয় সর্দ্দার ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের ঈর্ষ্যাকুল হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য সেই অলোকসামান্যা নারীর হত্যা সাধিত হইল। কিন্তু তদীয় রক্তপাতেও এই সকল সর্দ্দারের ঈর্ষ্যানল নির্ব্বাপিত না হওয়াতে তাঁহারা পাদশাহ আকবরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

এই আহ্বানে আকবরের তরুণ হৃদয়ে বীরপ্রসবিনী মিবার ভূমি জয় করিয়া খ্যাতিলাভের অভিলাষ পুনর্ব্বার জাগ্রত হইয়া উঠিল; তিনি দ্বিতীয়বার বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে চিতোরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া দুর্ব্বল উদয়সিংহ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু বীরভূমি মিবার শক্রর আক্রমণে বীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল;

বহুসংখ্যক বীরপুরুষ আকবরের বিরুদ্ধে কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পুরুষসিংহ জয়মল্ল এই সকল বীরপুরুষের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বিপুল বিক্রমে শত্রু নাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হইল; অধিনায়ক জয়মল্ল শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গগামী হইলেন। তাদৃশ পরাক্রান্ত অধিনায়কের আকস্মিক মৃত্যুতে রাজপুত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

স্বদেশ মিবারের এই ঘোর বিপদ দর্শন করিয়া কৈলবারা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ষোড়শবর্ষীয় পুত্তের মাতা কর্ম্মদেবীর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় পুত্রকে রণক্ষেত্রে গমন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিশোরবয়স্ক পুত্ত মাতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পত্নী কমলাবতী ও ভগিনী কর্ণবতীর নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা সহর্ষে তাঁহাকে যুদ্ধে গমন জন্য অনুমতি দিলেন। পুত্ত অন্তরঙ্গ বর্গের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক অতুল সাহসের সহিত জীবন পণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজপুতসৈন্য অভিনব নেতার অধীনে পরিচালিত হইয়া পুনর্ব্বার নবতেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগল সৈন্য দুইদলে বিভক্ত হইল; একদল সম্মুখ হইতে পুত্তকে আক্রমণ করিল; স্বয়ং সম্রাট আকবর অপর দলের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া পুত্তকে অন্যদিক হইতে আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। এই বিপদ নিবারণ-কল্পে তদীয় মাতা, পত্নী ও ভগিনী অশ্বারূঢ়া হইয়া লোকাতীত পরাক্রমে আকবরের সৈনাপত্যাধীন মোগলসেনার গতিরোধ করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। একজন বর্ষীয়সী রমণী এবং দুইজন ঈষদুদ্ভিন্ন কমল-দলের ন্যায় অপূর্ব্ব যুবতীর অব্যর্থ বাহুবলে বিপুল সৈন্যের অধিপতি আকবর রুদ্ধগতি হইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশে চতুর্দ্দিকে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুইপ্রহর

হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলিল; বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী, বীরবালা ও বীরবধূসহ অসীম পরাক্রমে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন। মোগলসৈন্য উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বীরবালা কর্ণবতী শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত কলেবরে বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কর্ম্মদেবী প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যুতেও অবিচলিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারও মৃত্যু আসন্ন হইয়া আসিল; বহুসংখ্যক ক্ষত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ জন্য তিনি অবসন্ন দেহে ভূতলে পতিত হইলেন। অচিরে বীর্য্যবতী বধূও তাঁহার পার্শ্বে ভূতলশায়িনী হইলেন। তন্মুহূর্ত্তে মহাবীর পুত্ত মোগলবাহিনী অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া মাতা ও পত্নীকে তুলিয়া ধরিলেন; তদবস্থায় কমলাবতী স্বামীর বাহুমূলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। স্নেহের আধার পুত্রবধূর প্রাণ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই কর্ম্মদেবীও মরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরলোকে গমন করিলেন; মৃত্যুকালে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দেহপাত পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিয়া গেলেন। মিবারগৌরব পুত্ত তাদৃশ দৃশ্য অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর মাতার আজ্ঞা অনুসারে অসি হস্তে শত্রুকুল মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুনাশ করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিলেন, "জননীর কোলে শিশু,—যেমতি লভয়ে বিরাম"।

তৃতীয়া

রাজপুতনার অন্তর্গত ক্ষুদ্র অরিন্ত নগরের অধিপতি মাণিক রাও, রাঠোর বংশীয় রাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত রাজকুমারী কর্ম্মদেবীর শুভবিবাহের প্রস্তাব অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিণয়

ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পুগলের রাজকুমার সাধু, একটি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনকালে মাণিকরাওর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার অসীম বীরত্ব, অবিচলিত সাহস এবং প্রবলপ্রতাপের খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত ছিল। বীরবালা কর্ম্মদেবী রাজকুমার সাধুর কীর্ত্তি কাহিনী শ্রবণ এবং তাঁহার বীরত্ব ব্যঞ্জক অনুপম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। "সৌন্দর্য্যলীলাময়ী উদ্যানলতা সুদৃঢ় আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল।" রাজকুমারী পূর্ব্ব বিবাহের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া সাধুর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। এই পরিণয়ের ফলে প্রবলপরাক্রান্ত রাঠোর বংশের সহিত দারুণ কলহ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও বীরবর সাধু বীর-বালার অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অতঃপর তিনি পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মদেবীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

বিবাহান্তে সাধু নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় রাজ্যাভি-মুখে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। পথিমধ্যে অপমান পীড়িত অরণ্যকমল কর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া মাণিক রাও তাঁহাদের সঙ্গে সৈন্য প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ;—কিন্তু সাধু এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভরপূর্ব্বক কেবল আপনার সাতশত সহচর এবং শ্বশুরের পঞ্চাশ জন সৈন্য সমভিব্যাহারে অরিন্তনগর হইতে বহির্গত হইলেন।

নবীনদম্পতি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই প্রতিহিংসাকুল অরণ্যকমল বৈরনির্য্যাতন মানসে চতুঃসহস্র সৈন্যসহ সাধু এবং তদীয় সহচর-বৃন্দকে আক্রমণ করিলেন। বীরসিংহ সাধু তাদৃশ বিপুল সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও অবিচলিত সাহসে সসৈন্যে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুকোমল কুসুমকামিনী কর্ম্মদেবী নির্ভীক

হৃদয়ে এই ঘোর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। সাধু এবং তদীয় সৈন্যের ভীম বাহুবলে ছয়শত রাঠোর সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন করিল। রাঠোর সৈন্যও অর্দ্ধ পরিমিত শত্রুসেনা ভূতলশায়ী করিতে সমর্থ হইল। এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও কর্ম্মদেবী অবিচলিত রহিলেন, এবং তেজোগর্ভ বাক্যে স্বামীকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সাধু রাজকুমার অরণ্যকমলকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ধর্ম্মশীল অরণ্যকমল তাদৃশ অসম যুদ্ধ অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সাধুর আহ্বানে অগ্রসর হইলেন। বীরকুলোচিত রীতি অনুসারে তাঁহারা পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া যুদ্ধার্থ অস্ত্র উন্মুক্ত করিলেন। তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। অবশেষে অরণ্যকমল, সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে সমর্থ হইলেন.; মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল, সাধুর ছিন্নশির ভূতলে পতিত হইল।

বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী স্বচক্ষে প্রাণাধিক স্বামীর মৃত্যু দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে সুখের মোহিনীমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল, কিন্তু তিনি বিহ্বল চিত্তে ক্রন্দন করিয়া শোক প্রকাশ করিতে বিরত রহিলেন। কর্ম্মদেবী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়া বিরহের তীব্র জ্বালা নিবারণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তেজস্বিনী কর্ম্মদেবী বাম হস্তে তরবারি ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সে ছিন্ন বাহু স্বীয় নিদর্শন স্বরূপ শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার আদেশক্রমে একজন অনুচর তদীয় বাম বাহুও ছিন্ন করিয়া ফেলিল; এই বাহু উপহার স্বরূপ মহিলকবিকে প্রেরিত হইল। ইহার পর চিতা সজ্জিত হইল, পতিপ্রাণা কর্ম্মদেবী স্বামীসহ চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া অমরলোকে গমন করিলেন।

রাণী ভবানী *

রাণী ভবানী প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যনারী। তাঁহার পুতচরিত বাঙ্গালীর সাহিত্যে এবং জনশ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি শ্রবণে আপামর সাধারণ সকলের হৃদয়েই ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার পবিত্র কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশে পুঁঠিয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন; এই রাজ সরকারে কামদেব নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সামান্য তহশীলদারী চাকুরী করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ রামজীবন, মধ্যম রঘুনন্দন, কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম।

মধ্যম পুত্র রঘুনন্দন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন; তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই আপন প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক পুঁঠিয়ার রাজ সরকারে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন।

পুঁঠিয়ার অধিপতি দর্পনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনের তাদৃশ প্রতিভা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় জমিদারীর হিসাব নিকাশ পরিস্কার করিবার জন্য প্রতিনিধিরূপে নবাব দরবারে প্রেরণ করেন। তৎকালে অর্থাৎ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরীতে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল এবং আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্মান বাঙ্গালার নবাব

---

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত রাণী ভবানী এবং ৺ নীলমণি বসাক কৃত নবনারী অবলম্বনে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। রাণীর দয়া দাক্ষিণ্যের বৃত্তান্তের অনেক অংশই নবনারী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; কেবল স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রন্থ ব্যতীত রিয়াজ-উস-সালাতিন, কালী প্রসন্ন বাবুর ইতিহাস, Stewart's History of Bengal এবং Rajas of Rajshahi হইতেও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।
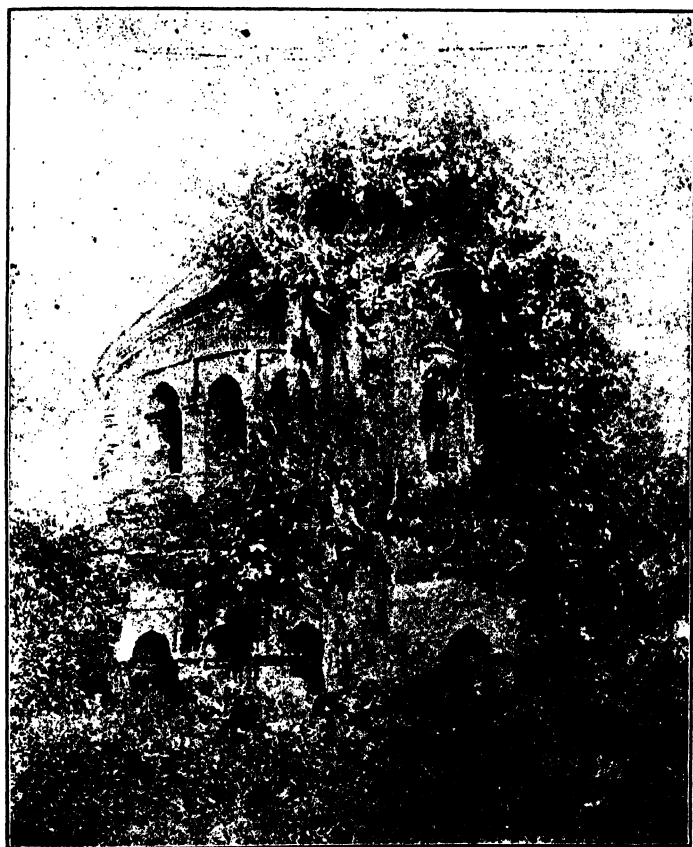
ছাতিন গ্রাম—রাণী ভবানীর পিত্রালয়।

নাজিম ও অনুগ্রহভাজন মুর্শিদকুলি খাঁ নবাব দেওয়ান ছিলেন। প্রতিভার অবতার স্বরূপ রঘুনন্দন নূতন পদে বৃত হইয়া সহজে ও সুকৌশলে হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করিবার এক অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন; ইহার ফলে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে নায়েব "কাননগুর" পদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করিলেন।

প্রতিভাশালী রঘুনন্দন নায়েব কাননগুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতা সহকারে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে হিসাব নিকাশ দিবার জন্য দক্ষিণাপথে স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। মুর্শিদ-কুলি খাঁ সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত হিসাব প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাননগু দ্বয়কে যথারীতি স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। আজিম ওশ্মানের সহিত মুর্শিদকুলি খাঁর ঘোর শত্রুতা ছিল। এই কারণ আজিম ওশ্মান মুর্শিদকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে কাননগুদ্বয়কে নিকাশী কাগজ স্বাক্ষর করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা রাজকুমারের অনুরোধ উপেক্ষা করা সমীচীন বিবেচনা না করিয়া নিকাশী কাগজ স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। কাননগুর স্বাক্ষর ব্যতীত নিকাশী কাগজ বাদশাহী সেরেস্তায় গৃহীত হইত না বলিয়া মুর্শিদকুলি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেন এবং অনন্যোপায় হইয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ জন্য নায়েব কাননগু রঘুনন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সুকৌশল চেষ্টায় দ্বিতীয় কাননগু জয়নারায়ণ নিকাশী কাগজে স্বাক্ষর করিলেন। অতঃপর মুর্শিদ কুলি খাঁ দরবারে উপনীত হইয়া বঙ্গদেশজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্য এবং উদ্বৃত্ত রাজস্ব প্রদান করিলেন, সেরেস্তায় নিকাশী কাগজ দাখিল করিয়া নিজ কার্য্য দক্ষতার প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্রাটের অধিকতর অনুগ্রহভাজন হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে

বঙ্গদেশের দেওয়ানী কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা আজিম ওশ্মানের সহকারীরূপে নিজামতি কার্য্য ভারও অর্পণ করিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সগৌরবে বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুখসুসাবাদে (মুখসুসাবাদ পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত হয়) আপন কার্য্যালয় স্থাপন করিলেন এবং উপকারী রঘুনন্দনকে রায় রায়ান উপাধি এবং দেওয়ানী পদ দিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদ নগরীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত জন্য মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্য্যে কাননগু দর্পনারায়ণ ও দেওয়ান রঘুনন্দন তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই দুইজন মধ্যে অর্থনীতিকুশল রঘুনন্দনের সহায়তাই অধিকতর কার্য্যকর হইয়াছিল। নূতন বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব ১৩১১৫৯০৭ হইতে ১৪২৮৮১৮৬ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁ অতি কঠোর হস্তে এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন জমিদার নিয়মিত সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নির্ম্মম ব্যবহারে আপনাদের জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইলেন। বাজেয়াপ্ত জমিদারী সকলের জন্য নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই সময় দেওয়ান রঘুনন্দন রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি চরম সীমায় উঠিয়াছিল। রঘুনন্দন পূর্ব্বাধিকারিচ্যুত জমিদারী সমূহ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। রাম-জীবন কৌশলনিপুণ সুশাসক ছিলেন। তিনি নিয়মিতরূপে রাজস্ব পরিশোধ করিতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই নবাবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। জমিদার রামজীবন নাটোরে বহুবায়তন সৌষ্ঠবশালী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া জমিদারী শাসন করিতে লাগিলেন।

নাটোর রাজ বংশের প্রথম জমিদারীর নাম বনগাছী। এই জমিদারী ক্ষুদ্র ছিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর রঘুনন্দনকে এই জমিদারী উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। গঙ্গার পশ্চিম তটস্থ এবং রাজমহলের অনতিদূরবর্ত্তী রাজসাহী পরগণার জমিদার উদয়নারায়ণ রাজস্ব দিতে অসম্মত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। নবাব এই বিস্তীর্ণ জমিদারী রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজসাহী পরগণা রামজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল। রামজীবনের প্রধান জমিদারীর নামানুসারে তাঁহার সমস্ত জমিদারী রাজসাহী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। রাজসাহী পরগণা লাভের সমকালেই আত্রেয়ী ও করতোয়া-নদীবিধৌত বিস্তীর্ণ ভাতুরিয়া জমিদারীর অধিকারিণী রাণী সর্ব্বাণী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করাতে অথবা যথাসময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়াতে মুর্শিদকুলি খাঁ রামজীবনকে উহা অর্পণ করেন। বঙ্গের বীর সন্তান সীতারাম রায়ের উচ্ছেদের পর তাঁহার সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকাংশ রামজীবনের হস্তগত হয়। যশোহর অঞ্চলের টুনকি স্বরূপপুরের জমিদার (সুজাত খাঁ ও নজাত খাঁ আফগানী) দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া নবাবের রাজস্ব লুণ্ঠন করেন। নবাব এই জমিদার দ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের জমিদারী রামজীবনকে প্রদান করেন।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরগণার পর পরগণা রামজীবনের হস্তগত হইতে থাকে এবং ন্যূনাধিক সপ্তদশ বৎসর মধ্যে বার হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক স্থানে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্ত্তমান রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের অধিকাংশ, বগুড়া ও পাবনার প্রায় সমস্ত অংশ এবং রঙ্গপুর ও যশোহর-খুলনার অর্দ্ধাংশ তাঁহার জমিদারী ভুক্ত ছিল। মহারাজ রামজীবন বঙ্গদেশের এই

বিপুল অংশে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদয় ক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন। ফলতঃ নবাব দরবারে তাঁহার পদগৌরব অতুল ছিল, হিন্দু সমাজ তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।

সৌভাগ্যলক্ষীর ঈদৃশ বরপুত্র মহারাজ রামজীবনের শেষ জীবন দুঃখ ও বিষাদে পূর্ণ হইয়াছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ হঠাৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই "নাটোর রাজ বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ" রায়রায়ান রঘুনন্দন পরলোক গমন করিলেন। উপর্য্যুপরি দারুন শোকে ক্লিষ্ট হইয়া রামজীবনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রামজীবন ও রঘুনন্দন,—দুই ভ্রাতায় মিলিত হইয়া উৎকট সাধনা বলে যে বিপুল রাজসাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এখন কে উপভোগ করিবে, এই দুশ্চিন্তায় রামজীবন পীড়িত হইতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজনগণ মধ্যে অনেকে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন, কেহ কেহ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ রামজীবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে পোষ্যপুত্রই গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই পোষ্যপুত্র মহারাজ রামকান্ত নামে পরিচিত রহিয়াছেন। রামকান্ত রাজসাহী জেলার ছাতিনা গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজকুললক্ষ্মীই আমাদের চির-পরিচিতা রাণী ভবানী।

মহারাজ কুমার রামকান্তের সহিত ভবানী দেবীর শুভ পরিণয়ের পর অল্প দিন মধ্যেই মহারাজ রামজীবনের লোকান্তর ঘটিয়াছিল। রামজীবন মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর এবং ধর্ম্মভীরু

কার্য্যকুশল কর্ম্মনায়ক দয়ারামকে রামকান্তের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। মহারাজ রামজীবনের মৃত্যুকাল ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ।

মহারাজ রামজীবনের পরলোক গমনের পর মন্ত্রী দয়ারাম অতি যোগ্যতা সহকারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী দয়ারামের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে গৌরব মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, অচল প্রভুভক্তি, কঠোর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহার নাম গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। দয়ারাম চারি বৎসর কাল রাজসাহীর কার্য্যভার পরিচালনা করিলেন। তারপর রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক আপন বৈষয়িক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রামকান্ত রাজ্যভার গ্রহণ কালে তরুণ বয়স্ক যুবক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট দৃঢ়তা ও কার্য্যকুশলতা ছিল। তিনি যোগ্যতা সহকারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ এবং নিয়মিত সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইলে মহারাজ রামকান্ত এবং তদীয় সহধর্ম্মিনী রাণী ভবানী এক অভাবনীয় বিপদ জালে জড়িত হইয়া পড়েন।

মহারাজ রামজীবন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত রাজ সম্পদ অর্পণ করাতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ ঈর্ষ্যাকুল হইয়া উঠেন। এই কারণ মহারাজ রামজীবনের পরলোক গমনের পর তিনি রামকান্তের ধ্বংস সাধন করিয়া রাজসাহীর রাজ সম্পদ হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হন এবং সমুচিত ধৈর্য্য সহকারে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ অন্বেষণে নিরত থাকেন। মহারাজ রামজীবনের পরলোক গমনের ন্যূনাধিক দশ বৎসর পরে বঙ্গের রাজলক্ষ্মী মুর্শিদকুলি খাঁর বংশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষসিংহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে দেবী

প্রসাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুশাসক ছিলেন, কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়া সহজেই কর্ণ-জেপগণের বাক্যে বিচলিত হইলেন এবং দেবীপ্রসাদকে রাজসাহী রাজ্যের ভার অর্পণ করিলেন। দেবীপ্রসাদ চিরাভিলষিত নবাবী সনন্দ হস্তগত করিয়া দ্রুতগতিতে নাটোর উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে গৃহবহিস্কৃত করিয়া সগৌরবে রাজসাহীর শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। *

মহারাজ রামকান্ত রাজ্যচ্যুত হইয়া মহিষী সহ জগৎ শেঠের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং নাটোর বংশের চিরহিতৈষী দয়ারামের সহায়তায় নবাব দরবারে আবেদন পাঠাইলেন। নবাব দরবারে জগৎ শেঠের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহার অনুরোধে এবং দয়ারামের কৌশলে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ অবিলম্বে মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কয়েক মাস মধ্যেই মহারাজ রামকান্তকে অপহৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

বিপুল রাজসম্পদ লাভ করিয়াও মহারাজ রামকান্ত এবং রাণী ভবানী জীবনে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেন নাই। এই রাজদম্পতির সন্তান ভাগ্য অপ্রসন্ন ছিল। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে দুই পুত্র লাভ করেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীকান্ত একাদশ মাসে এবং কনিষ্ঠ পুত্র নামাকরণের পূর্ব্বেই পিতা মাতার হৃদয়ে শোকশল্য বিদ্ধ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। অতঃপর এক কন্যারত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজপুরী

---

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকের লেখক ৺ মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাজ নন্দকুমারের চক্রান্তে দেবীপ্রসাদের রাজ্যলাভ ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

আলোকিত করেন। এই কন্যা ইতিহাস পরিচিতা তারা সুন্দরী। তারা সুন্দরীর শৈশবকালেই রামকান্ত পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ।

মহারাজ রামকান্তের জীবদ্দশাতেই রাণী ভবানীর বিমল যশঃপ্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এ কারণ মহারাজের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে রাজসাহী রাজ্যের অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার বিষয়তৃষ্ণার অভাব ছিল বলিয়া তিনি রাজকুমারী তারাসুন্দরীকে সৎপাত্রস্থ করিয়া জামাতার হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে রাজসাহীর খাজুরা গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে মহা সমারোহে তারা সুন্দরীর বিবাহ দিলেন, এবং জামাতার নামে নবাবের সেরেস্তায় নামজারী করিয়া লইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের অল্প দিবস মধ্যেই রঘুনাথ পরলোক গমন করিয়া রাজকুমারীকে চিরদুঃখিনী করিলেন।

এই দুর্ঘটনায় রাণী ভবানী অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মচর্য্যা ও পরসেবা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। রাণী ভবানী ধর্ম্মপ্রাণা লোক হিতৈষিণী শাসনকর্ত্রী ছিলেন।

রাণী ভবানী সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জপ করিতে আরম্ভ করিতেন। জপ শেষে স্বহস্তে পুষ্পচয়নে নিরত হইতেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা স্নান পূর্ব্বক বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দেবপূজা ও দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দান এবং পুরাণ শ্রবণে অতিবাহিত করিতেন। তদন্তর তিনি বেলা আড়াই প্রহরের সময় স্বপাক হবিষ্যান্ন আহার করিতেন। তাঁহার আহারের পূর্ব্বে ঐ হবিষ্যান্ন দ্বারা দশ জন ব্রাহ্মণের ভোজন হইত। রাণী ভবানী

আহারান্তে দেওয়ান খানায় কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কর্ম্মচারিগণকে বিষয় কর্ম্ম সম্পর্কে আদেশ প্রদান করিতেন। এই কার্য্য অন্তে পুরাণ পাঠ আরম্ভ হইত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার বিষয় কর্ম্ম হইত। তৎকালে রাণী ভবানী কাগজ পত্রাদি স্বাক্ষর করিতেন। সায়ংকালে তিনি গঙ্গা দর্শন করিয়া ঘৃত প্রদীপ দিতেন। রাণী ভবানী গঙ্গাতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত মালা জপ করিতেন। তারপর জলযোগ করিয়া বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে পরামর্শ এবং প্রজাপুঞ্জের অভিযোগাদি শ্রবণে নিরত হইতেন। এই সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি সদালাপ এবং পৌরগণের তত্ত্বাবধানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিশ্রাম জন্য শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতেন।

রাণী ভবানী দেবসেবা, অতিথি সেবা এবং লোক সেবার জন্য জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেন। আমরা এই পুণ্যকীর্ত্তির কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। রাণী ভবানীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেবের কঠোর শাসনে হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। রাণী ভবানীর অসংখ্য কীর্ত্তিমধ্যে কাশীর লুপ্তোদ্ধার সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রাণী ভবানী কাশীধামে বহুমূর্ত্তি ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন; এতন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, দুর্গা, তারা ও রাধাকৃষ্ণ প্রধান। এই সকল দেবমূর্ত্তি ব্যতীত শত শত শিবলিঙ্গ ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির জন্য সুদৃশ্য মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া বহু সংখ্যক প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট কাশীর নিম্ন বাহিনী গঙ্গার শোভা বর্দ্ধন করিত। রাণী ভবানী বহু অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি তীর্থবাসিগণের বাস জন্য তিন শত বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। যে সকল লোক অসঙ্গতি বা শেষ অবস্থা

নিবন্ধন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসের ইচ্ছা করিত, তাহাদিগকে সপরিবারে ঐ সকল বাটীতে স্থানদান পূর্ব্বক যাবজ্জীবন অন্নদান করিবার নিয়ম ছিল। এই সকল বাটীতে যাহাদের মৃত্যু ঘটিত, তাহাদের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনের ব্যবস্থাও ছিল। রাণী ভবানী কাশীর চতুর্দ্দিকে পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক এক ধর্ম্ম চৌকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধর্ম্মচৌকায় একটি পিলপা, একটি বৃক্ষ ও একটি কূপ ছিল। ভারবাহী শ্রমজীবি অথবা পথিক পরিশ্রান্ত অথবা পিপাসার্ত্ত হইলে ধর্ম্ম চৌকার পিলপার উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া বৃক্ষ মূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জলপানাদি করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিত। মোট বা দ্রব্যাদি নামাইবার এবং তুলিবার সময় কাহারও সহায়তা আবশ্যক হইত না। ঐসকল ধর্ম্ম চৌকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে বহুস্থানে প্রশস্ত জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল জলাশয়তীরে পথিকগণের বিশ্রাম, রন্ধন ও আহারের জন্য চুল্লী, বাটী, জল পাত্র, তণ্ডুলাদি এবং ফলমূল প্রস্তুত থাকিত। তজ্জন্য পথিকেরা স্বচ্ছন্দে আহার ও বিশ্রাম করিতে পারিত। নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে একটী প্রস্তরের চৌবাচ্চাতে আট মণ বুট ভিজান হইত; এই সকল বুট যাত্রীমাত্রেই আহার করিতে পারিত। অন্নপূর্ণার বাটীতে প্রত্যহ পঁচিশ মণ তণ্ডুল বিতরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। দেবদেবীর পূজা ও ভোগের যেমন ধুম ধাম, সেইরূপ পারিপাট্য ছিল। তাঁহাদের ভোগের জন্য অন্ন ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত, চারি পাঁচ সহস্র লোক উত্তমরূপে আহার করিত। প্রত্যহ ১০৮ জন দণ্ডী, কুমারী ও সধবা ইচ্ছাভোজন করিতেন। এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিবার নিয়ম ছিল। রাণী ভবানীর মনুষ্যের প্রতি যেরূপ কৃপা ছিল, জীব জন্তুর প্রতিও সেইরূপ ছিল।

কথিত আছে, কাশীর পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে যে যে স্থানে পক্ষী ইত্যাদি বাস করিত, সেই সেই স্থানে অন্ন নিক্ষিপ্ত হইত; পিপীলিকাদির গর্ত্তের ভিতরে এবং সম্মুখে চিনি এবং অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য প্রদত্ত হইত।

রাণী ভবানী রাজসাহী এবং নাটোরে বহু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নাটোর গঙ্গাহীন স্থান বলিয়া তিনি অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী জাহ্নবীর তটস্থ বড়নগর গ্রামে বাস করিতেন। বড়নগরে বহুসংখ্যক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাণী ভবানী স্বরাজ্যে বহুসংখ্যক আখড়া ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ এবং গঙ্গাবাসী, ক্ষেত্রধামবাসী ও আখড়াবাসী মহন্তদিগকে বৎসর বৎসর একলক্ষ আশী হাজার টাকা নগদ বৃত্তি দিতেন। তাঁহারা এই অর্থ দ্বারা দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। প্রাগুক্ত বৃত্তির ২০।২৫ হাজার টাকা অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপক পণ্ডিতগণ তাদৃশ রাজবৃত্তি দ্বারা টোল স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন।

নগদ বৃত্তি ব্যতীত রাণী ভবানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণকে ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও মহাত্রাণ দিয়াছিলেন। তাদৃশ ভূমির কর ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও রাণী ভবানী প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বে অনেক লোক সুখে কাল যাপন করিতেছেন।

রাণী ভবানী রোগীর চিকিৎসার জন্যও উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি আট জন বৈদ্য বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বড়নগর ও তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সাতখানা গ্রামের সমুদয় রোগীর চিকিৎসা

করিতেন। এই আটজন বৈদ্যের দুইজন ভৃত্য নিয়োজিত ছিল, তাহারা রোগীদিগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বৈদ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক চিকিৎসকের সঙ্গে দুই তিন জন ভারী পাচন, ক্ষুদ্র মৎস্য, পুরাতন তণ্ডুল, মুগের দাইল, মিছরি ও রোগীর পথ্য অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যাইত। তাহারা চিকিৎসকের বিধান মত রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিত। প্রাগুক্ত সাতখানি গ্রামে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সৎকারাদির ব্যয় সরকার হইতে দিবার নিয়ম ছিল।

রাণী ভবানী দীন দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের সৎকার জন্য পাঁচ টাকা ও শূদ্রের সৎকার জন্য তিন টাকা করিয়া দিতেন। সতী স্ত্রী পতির সহগমন করিলে একখান বস্ত্র, এক জোড়া শাঁখা এবং অবস্থা বিবেচনায় ৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত নগদ সাহায্য প্রদান করিতেন।

রাজসাহী রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে রাণী ভবানী কন্যাদানের সমুদয় ব্যয় নিজে দিতেন। দুর্গোৎসব কালে ২০০০ পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া কুমারী ও সধবাদিগকে প্রদান করিতেন। তৎসঙ্গে তাঁহাদের প্রতিজনকে একজোড়া শাঁখা ও স্বর্ণ নথ প্রদান করিতেন। পূজার সময় দেশীয় ও বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পঞ্চাশ সহস্র টাকা বার্ষিক দিতেন।

রাণী ভবানী সকল সময় স্বহস্তে দান করিতে পারিতেন না, এজন্য আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, দরিদ্র বা দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পোদ্দার এক টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিবেন, ধনরক্ষক একটাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন, এবং দেওয়ান ১০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান করিবেন। একশত টাকার অধিক হইলে রাণীর অনুমতি আবশ্যক হইত।

রাণী ভবানী রাজসাহী রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। এখনও বঙ্গদেশের নানাস্থানে শত শত জলাশয় বিদ্যমান থাকিয়া রাণী ভবানীর মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

রাণী ভবানী বঙ্গদেশে কতিপয় রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নির্ম্মিত পথের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তৎসমুদয়ের পার্শ্বে জলাশয় এবং জলাশয়ের তীরে চুল্লী, ভোজনপাত্র, পানপাত্র প্রভৃতি রক্ষিত থাকিত।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ধর্ম্মপ্রাণতা এবং লোকহিতৈষিতা কীদৃশ প্রবল ছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা কিরূপ অসামান্য ছিল, আমরা তাহাই এখন প্রদর্শন করিতেছি। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বের সময় হইতে বঙ্গীয় জমিদারগণের অতি সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল ; অনেক প্রাচীন জমিদার বংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল ; সময় মত রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলেই অনেক জমিদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইত, তাঁহাদের স্থলে নূতন জমিদার নিয়োজিত হইতেন। রাণী ভবানীর সময়েও জমিদারগণের এই প্রকার অবস্থাই ছিল। রাণী ভবানী ধর্ম্মার্থ ও পরহিতকল্পে অজস্রধারে অর্থ ব্যয় করিয়াও তাদৃশ বিস্তীর্ণ জমিদারীর রাজস্ব সময়মত পরিশোধ করিতেন, ইহা অবশ্যই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাণী ভবানী কখনও প্রজাপীড়ন করিয়া আপন প্রাতঃস্মরণীয় নাম কলঙ্কিত করেন নাই ; এজন্য তাঁহার নিয়মমত রাজকর সংগ্রহ সমধিক বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

রাণী ভবানীর প্রথম সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের

মসনদে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজ কোম্পানীর সহায়তায় সেনাপতি মিরজাফরকে রাজ্যভার অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হন এবং এতৎ সম্বন্ধে রাণী ভবানীর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। বিশ্বাস-ঘাতকতা অধর্ম্মজনক ও রাজবিপ্লব প্রকৃতিপুঞ্জের অহিতকর বলিয়া তিনি প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, ঐ ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে শাঁখা, সিন্দুর ও শাটী উপঢৌকন পাঠাইয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, তাদৃশ কার্য্য নারীজনোচিত অপকার্য্য। কিন্তু বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট রাণী ভবানীর মত উপেক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহারা ইংরাজ কোম্পানীর সহায়তায় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া মির জাফরকে নবাব করেন। ইহার ফলে অচিরে বঙ্গদেশের শাসনাধিকার মুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরেজ কোম্পানীর হস্তগত হয়।

ইংরেজ কোম্পানীর অসাধারণ সাধনায় বঙ্গদেশের রাজশাসন সুব্যবস্থিত হয় এবং প্রজাকুল সুখ শান্তিতে বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু রাজবিপ্লবের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

এই দুঃসময়ে রাণী ভবানী সবিশেষ দক্ষতা সহকারে প্রজার রক্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাবৃন্দ দস্যু তস্করের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সুব্যবস্থায় প্রজাবৃন্দ অপেক্ষাকৃত সুখ শান্তিতে বাস করিতে পারিয়াছিল।

ফলতঃ আপন সুবিশাল জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে রাণী ভবানীর মনস্বিতা, কার্য্যদক্ষতা এবং প্রজাহিতৈষিতা সবিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার মঙ্গলজনক শাসন সুদীর্ঘকাল ব্যাপী

হইয়াছিল। রাজকুমারী তারাসুন্দরী বিধবা হইলে রাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুত্র বঙ্গের চিরস্মরণীয় সাধক-শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ। মহারাজ রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী ভবানী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করেন।

শিবপূজানিরতা অহল্যাবাই

অহল্যাবাই

প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইর জীবনের পবিত্র কথা বঙ্গসাহিত্যে একাধিকবার বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তদীয় পুতচরিত পুনঃ পুনঃ আলোচনার যোগ্য। এ কারণ আমরা তাঁহার পুণ্যকাহিনী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয়ের ফলে ভারতবর্ষে ঘোর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই রাজবিপ্লবের ঘূর্ণণে রাজা হঠাৎ পথের কাঙ্গাল হইতেছিলেন এবং পথের কাঙ্গাল ভাগ্যলক্ষ্মীর অচিন্ত্য কৃপায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সৌভাগ্যশালী পুরুষগণ মধ্যে মলহর রাওর নাম উল্লেখযোগ্য।

মলহররাও ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা একজন মেষপালক ছিলেন। মধ্য ভারতের নীরা নদীর তীরে হোল নামক পল্লীতে তাঁহার বাস ছিল। আদি বাসস্থানের নামানুসারে মলহররাও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হোলকার হইয়াছে। 'কার' শব্দের অর্থ অধিবাসী।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মলহররাও পেশওয়ার সৈন্য বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। ইহার পর তদীয় জীবন অবিচ্ছিন্ন ক্রমিক উন্নতির ইতিবৃত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মলহর অধ্যবসায় ও শৌর্য্য বীর্য্যের অবতার স্বরূপ ছিলেন। তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে সুদীর্ঘ কাল (১৭২৪—৬৫) ব্যাপি সাধনায় এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজস্ব ৭০ লক্ষ মুদ্রা ছিল।